প্রচ্ছদ : নমিতা ঘোষ

প্রকাশক : শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ
জয়শ্রী প্রেস
১সি. শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

ডক্টর ভবতোষ দত্ত,

অগ্রজপ্রতিমেষু

এই বইয়ে যে পাঁচটি প্রবন্ধ সংকলন করা হলো, তার বিষয় কবি ও তাঁর কবিতা, এবং সন্দেহ নেই, প্রবন্ধগুলি সাধারণভাবে বিচ্ছিন্ন। এর মধ্যে অবিচ্ছিন্নতার যোগ যদি ব্যাখ্যা করতেই হয়, তাহলে একথা বলা ছাড়া উপায় নেই যে, সব কটি প্রবন্ধই কবি ও তাঁর কবিতা নিয়ে লেখা এবং পাঁচজন কবিই মোটামুটি রবীন্দ্রকালের অন্তর্গত। রবীন্দ্রকালে কবিতা লিখে অনেক কবিই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, তবু কেন এই ক'জন কবিকে নিয়েই প্রবন্ধগুলো লেখা, তার কোন সদুত্তর নেই, শুধু এইটুকু বলা সম্ভব যে নির্বাচন এখানে নির্বিচার। আসলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে লেখা হয়েছিল প্রবন্ধগুলি, সেগুলো এক জায়গায় ক'রে রাখা গেল। এখানে যে মত প্রকাশ করা গেল, তা কতখানি গ্রহণযোগ্য, প্রকৃতপক্ষে, তারও একটা পরীক্ষা হওয়া উচিত।

আলোচিত কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন-ই জ্যেষ্ঠ এবং এই কারণের বইয়ের নামকরণে তাঁকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে! জীবনানন্দের কবিতার ওপর যে লেখাটি আছে, সেটি আসলে একটি বক্তৃতা, পড়া হয়েছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আধুনিক কবিতা-বিষয়ক একটি সেমিনারে; লেখাটি গ্রন্থভুক্ত করার অনুমতি দিয়ে বিভাগীয় অধ্যক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ করেছেন।

এই প্রবন্ধগুলি রচনায় ও প্রকাশনে আমার সর্বাধিক ঋণ তিনজনের কাছে: স্বর্গত কবি দুর্গাদাস সরকার, ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শ্রীদেবকুমার বসু। শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ বইটি প্রকাশ করেছেন স্বেচ্ছায় ও আগ্রহে, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ফাল্গুন, ১৩৫৭

শক্তিব্রত ঘোষ

১.
দেবেন্দ্রনাথ সেন ১১
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৪৪
নজরুল ইসলাম ৫৮
২.
অসহায় আবরণ :
প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ৮৭
স্মৃতির আকার :
জীবনানন্দ দাশের কবিতা ১০১

এই লেখকের অন্যান্য বই

রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙের দিনগুলি (২য় সং)
উইলিয়ম কেরী : সাহিত্য সাধনা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দেবেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ১৮৫৮ সালে, এবং ঐ বছরই বেরিয়েছিল রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও বিহারীলালের 'স্বপ্নদর্শন কাব্য'। ১৮৬০-এ মধুসূদন উপস্থিত হলেন তাঁর তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য নিয়ে, পরের বছরই প্রকাশিত হলো তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য', হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিনী' এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক'। ১৮৬২-তে বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতকের' সঙ্গে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' আর ১৮৬৬-তে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। ষাটের দশক শেষ হতে না হতে ১৮৭০-এই পাওয়া গেল বিহারীলালের 'বন্ধু বিয়োগ', 'প্রেমপ্রবাহিনী', 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' (১ম); গোবিন্দচন্দ্র দাসেব 'প্রসূন', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্য কলাপ,' বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা,' 'ললিত কবিতাবলী,' অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের জন্ম আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা মুহূর্তে। এবং তাঁর বাল্যাবস্থাতেই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠা চিহ্নিত হয়ে গেছে। মহাকাব্যের ধারাতে এই প্রতিষ্ঠার ভূমি রচিত হলেও তার প্রতিস্পর্দ্ধী গীতি কবিতার প্রাণ প্রবাহ একই সঙ্গে অনিবার্য বেগে বহমান ছিল। এখন পর্যন্ত স্থির হয়ে যায় নি কোন রীতিতে আধুনিক কবিতা জয়ী হবে, কিন্তু মহাকাব্যের স্থপতিবা যে গীতিকাব্যের ধারায় জল সিঞ্চন করে গেলেন, এই তথ্যটি ইতিহাসের দিক থেকে গুরুতর হয়ে ওঠে। মহাকাব্যের ভূমি ধীরে ধীরে ভিজে যাচ্ছিল, এবং গীতিঝংকারের মধ্যে বীরত্বের পরিণাম যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, অন্তত ১৮৬১ সালের বাংলা কবিতার পাঠকের চোখে সেই ছবি ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর চোখের সামনে যেমন 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছিল, তেমনি 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'ও ছিল। যেমন 'বৃত্রসংহার' ছিল, তেমনি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলীও' ছিল, 'দশানন বধ' লিখতে গিয়েও সেটা তিনি শেষ করলেন না। ১৮৮০-তে যখন তাঁর কবিতাগ্রন্থ 'ফুলবালা' বেরলো, আর তারপরই 'নির্ঝরিণী', তখন বোঝা গেল কবির দ্বিধা অনেকখানি

কেটে গেছে, গীতিকবিতার রীতিতে তাঁর স্বভাবের অনুমোদন যে অধিক, তা মোটামুটি প্রত্যয়িত হয়ে গেল। তবু রবীন্দ্রনাথ যে বিহারীলালকে আধুনিক গীতি-কাব্য সাধনার উৎস পুরুষ বললেন, মধুসূদনের পাশাপাশি কাব্যমর্জির দিক থেকে প্রায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিহারীলাল যে সমাগত, তখনকার অনেকের মতোই দেবেন্দ্রনাথ তা নিরূপণ করতে পারেন নি ; অথচ সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবি যে তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছেন, তাঁর কাছে তা স্মরণীয় বলে মনে হয়েছে।

বিহারীলালের কবিতার কিছু প্রভাব দেবেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতায় থাকা সম্ভব, কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে তাঁর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা কি ছিল, তা অনুমানের বিষয় হতে পারে মাত্র। তিনি পরবর্তীকালে এই কথা মনে করে গৌরব বোধ করেছিলেন যে, "রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার নির্ঝরিণী কাব্যের 'আঁখির মিলন' কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল" ; এবং উর্মিলা কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রের উদ্ধারে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন : 'ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্ত কণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি।' এইসব তথ্য থেকে বুঝতে কষ্ট হয়না যে তখনো পর্যন্ত অগঠিত রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব তার কাছে ধরা পড়েছিল, যা সাধারণভাবে তাঁর কাব্যবিবেচনা শক্তির পরিচয় বহন করে।

দেবেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন 'কবিভ্রাতা'। উভয়েই বাংলা কবিতার সেবক, এই অর্থে দুই-এর মধ্যে কবি-ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল ; এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা থেকেই সূচিত। গাজি-পুরে রবীন্দ্রনাথ যখন অবস্থান করছেন, তখন প্রবাসী দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার বন্ধন গড়ে ওঠে। সেই সময়টিকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের 'দোলপূর্ণিমার দিন' বলে চিহ্নিত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতাম— তিনি আনন্দিত হইয়া শুনিতেন। তিনিও আপনার অপ্রকাশিত নূতন কবিতাগুলি আমাকে শুনাইতেন। আমি হর্ষবিহ্বল হইয়া শুনিতাম।' বোঝা যায়, কবিতাই উভয়ের ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে তুলেছিল, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ঐ উক্তির মধ্যেই তাঁর মনস্তত্ত্বটি ধরা পড়ে। তিনি নিজের পক্ষে 'হর্ষবিহ্বল' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর বিহ্বলতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন মনোভাবের প্রকাশক। মনে রাখা দরকার, ; এই সময়ে 'মানসী'র কবিতাগুলি রচিত হচ্ছে, কিন্তু 'মানসী'

প্রকাশিত হয়নি। অর্থাৎ সাহিত্যের বিবেচনায় গুরুতর শিল্প-ব্যক্তিত্বরূপে তখনো রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত হননি। কবির মগ্নতা ও মুগ্ধতা দিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ও অপ্রতিরোধ্যতা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শিল্পের ও কাব্যেতিহাসের বিবেচনায় তাঁর নিরূপণ সাধিত হয় নি। এবং হতে পারে, এই সময়কার ব্যক্তি ঘনিষ্ঠতা দেবেন্দ্রনাথকে অধিকতর রবীন্দ্রমুখী করে তুলবার পেছনে উপস্থিত ছিল।

কেননা দেবেন্দ্রনাথের বৃহত্তর কবি জীবনের বিকাশে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্পর্শ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই মধ্যস্থতায় 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়', এই যোগটিকে তিনি যে উল্লেখযোগ্য মনে করেছিলেন, এই সম্পর্কে প্রকাশিত তাঁর উচ্ছ্বাসই তার প্রমাণ। তিনি লিখেছিলেন, "একদিন রবিবাবু আমাকে বলিলেন 'ভারতীর সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এখানে আছেন, আপনার কতকগুলি কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইবার জন্য দিন'। অনুরোধ শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। কারণ ইতিপূর্বে আমার কোন কবিতা অথবা কোন প্রবন্ধ কোন প্রখ্যাত পত্রিকায় বাহির হয় নাই। তখন স্বর্ণকুমারী দেবীর খুব নাম— ভারতীর খুব নাম। খুব খাঁটি জিনিস না হইলে পত্রিকায় স্থান পাইত না"। এবং ১৮৮৮-তে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা 'ভারতী'তে বা কোন গুরুতর মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত আয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল, এবং এই যোগটি দেবেন্দ্রনাথকে এক ধরণের কৃতার্থতাবোধে আচ্ছন্ন করেছিল।

'মানসী'তেই বাংলা কবিতার আধুনিক মুক্তি সূচিত হয়েছিল, তারপর 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ইত্যাদি প্রকাশিত হলে আধুনিক বাংলা কবিতার গতি পথটি সাধারণ-ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এই পথটি যে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যধারা ও সংস্কার থেকে রূপগত ও প্রকৃতিগত উভয় দিক থেকেই পৃথক, অতঃপর তা সংশয়াতীত স্বীকৃতি পেল। অনেকে এই রীতির পক্ষপাতী ছিলেন না, দ্বিজেন্দ্রলাল তো স্পষ্টতই তার বিরুদ্ধতা করেছেন। কামিনী রায় তাঁর মনোভাবকে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন: 'তিনি যে রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরেজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 'স্কুলের' প্রবর্তক তাহা গভীরতা ত সজীবতার তত সন্ধান করেনা, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না'। তথাপি 'চিত্রাঙ্গদা'কে নীতির দিক থেকে আক্রমণ করেও দ্বিজেন্দ্রলাল অকপটেই বলেছেন, 'ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমাচ্ছটা অতুলনীয়—মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই।' কামিনী রায়ও 'লিখেছেন, তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা,

গীত-রচনার অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।' কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-সমস্যাকে নিরুপদ্রব শান্ততায় লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যখন গড়ে উঠেছিল তখন পর্যন্ত কাব্যরীতির দিক থেকে রবীন্দ্র-সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। এই কথাটি এইখানে স্মরণযোগ্য যে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুর মতো বলতে পারেন নি, তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই— উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও তেমনি, আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।' এবং সরলভাবে শুধু এইমাত্র বলেছেন—'রবিবাবু আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমার কোন মন্তব্য প্রকাশ চলে না। আমি তাকে খুব admire করি। তিনিও আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন এবং আমার কবিতারও পক্ষপাতী।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তিনি অকপটে বলতে পারেন, 'ঐ অপবাদ সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অসঙ্গত', অথবা কবিমতিত্বের সহজতায় কখনো অনায়াসে স্বীকৃতি জানান, 'আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়।'

ব্যক্তিগত বন্ধুতা ও পরস্পর গুণগ্রাহিতার আচ্ছাদনটি নিবিড় ছিল বলেই অনেক সময় মনে হতে পারে যে বাংলা কাব্যরীতির ক্ষেত্রে এই সময়কার রবীন্দ্র-সমস্যা দেবেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে পারে নি। তিনি পক্ষান্তরে রবীন্দ্র-প্রশস্তি-মূলক কবিতা লিখেছেন, তাঁর সনেটের উপর সনেট লিখেছেন, এমন কি তাঁর 'নারীমঙ্গল' কবিতায় নারীর সৌন্দর্য অনুসন্ধানে রবীন্দ্র-কবিতার উল্লেখ অনিবার্য বলে বোধ করেছেন। তথাপি কোন অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করতে পারেন না, বলতে হয়: 'এই রবীন্দ্রের যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত'।

এই উক্তিতে বিষাদ আছে, হয়তো পরাভববোধও আছে, কিন্তু কোন জ্বালা নেই। তিনি নিজের পরিধি ও ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এবং মেনে নিয়ে-ছিলেন নিজের সেই সীমাবন্ধন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা এই প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে। তাঁর কবিতা কেমন লাগে, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভাতকুমার বলেন—'রবিবাবুর পর আর যে সমস্ত কবি আছেন তাঁদের মধ্যে আপনাকে খুব উচ্চ আসনই দিই। তাঁদের অনেকের কাব্যেই রবিবাবুর সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, আপনার কাব্যে সেটি নাই। আপনার কাব্যের মধ্যে আপনার নিজের কণ্ঠস্বরটি বেশ স্পষ্ট।' দেবেন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেছিলেন, 'এই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশী কিছুই আমি আশা করি নে'। যে কবি নিজস্ব কণ্ঠস্বর

আয়ত্ত করতে পারেন,—তার চেয়ে বড় সার্থকতা আর কিছুই হতে পারে না। ছোট, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হলেও তার মধ্য দিয়েই কবি চিহ্নিত হয়ে যান। এবং এই কারণেই স্বাভাবিকভাবে দেবেন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের উত্তরে খুশি হয়েছিলেন।

কবিতা সংসারে আপন ক্ষেত্রটি দেবেন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। 'অশোকগুচ্ছে'র 'আমি কে' কবিতায় তিনি আত্ম-পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। ছ'টি স্তবকে সম্পূর্ণ এই কবিতায় তিনি নিজেকে 'বাংলার কবি' রূপে চিহ্নিত করেছেন। 'ক্ষুদ্র' বিশেষণে তিনি একই সঙ্গে বাংলা ও নিজের কবি-পরিচয়কে বিশেষিত করে-ছিলেন। বোঝা যাচ্ছে তিনি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন স্বক্ষেত্র, এবং এই নির্বাচিত পরিপ্রেক্ষিতেই ফলতঃ তাঁর কবি-পরিচয় বিষয়ক বিবেচনা প্রত্যাশিত হওয়া স্বাভাবিক। কবিকে তাঁর স্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করাই সম্ভবত সবদিক থেকে সমীচীন, অনেক ক্ষেত্রে তা করা হয়না বলেই কিছু কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কামিনী রায়ের একটি কথা এই প্রসঙ্গে সঙ্গত বলে মনে হতে পারে: 'তাঁহাকে (রবীন্দ্রনাথকে) মাপকাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব্ব কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়।'

২

দেবেন্দ্রনাথের প্রধান কাব্য 'অশোকগুচ্ছ' বেরোয়—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝখানে। 'হরিমঙ্গল' ছাড়া বাকি প্রায় সব কবিতার বইগুলির প্রকাশকাল ১৯১২। ১৯১৩-তে শুধু 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর আরো সাত বছর, ১৯২০ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি।

১৮৮৮ থেকে 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'নব্যভারত', 'প্রদীপ,' 'পুণ্য,' 'জাহ্নবী,' 'বাণী', 'মানসী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'প্রবাসী', এমনকি 'সবুজপত্রে'ও তিনি অজস্রধারে কবিতাবর্ষণ করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের প্রধান কাব্য-প্রকাশকালের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত। 'অশোকগুচ্ছ' বিশ শতকের প্রথম বৎসরের ফসল; কিন্তু তার আগে উনিশ শতকের নব্বই-এর দশকে বেরিয়ে গেছে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'। আরো আগে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিকে বঙ্কিমচন্দ্র যে মাল্যভূষিত করেন, সেই তথ্য প্রমাণ করে যে সাহিত্য ও শিল্পের বিবেচনায় বাংলা কাব্যে ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমাগত হয়েছেন। অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের মুখ্য কবিতা চর্চার কাল রবীন্দ্রনাথের

সমান্তরাল। ফলতঃ তিনি রবীন্দ্র সমসাময়িক ; বয়সের দিক থেকে তিন বছরের বড় ছিলেন যদিও। হয়তো বয়সের বিবেচনাতেই দেবেন্দ্রনাথকে অক্ষয়কুমার বড়ালের মতো রবীন্দ্র পূর্ববর্তীরূপে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থাপন করা হয়, কিন্তু এই যুক্তি স্বভাবতই অভ্রান্ত হতে পারে না। কিন্তু শুধু কি বয়সের জন্যই তিনি রবীন্দ্র-পূর্ববর্ত্তী ? তাঁর কবিতার ভাষা ভাবাবয়ব ও উচ্চারণধর্মের দিক থেকে দেখলেও তাঁকে স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্র চেতনার পূর্ববর্ত্তী বলে চিহ্নিত করতে হয়। তাঁর রূপতন্ময়তা একটি আধুনিক মনোবৃত্তি বটে, যা romantic চেতনার প্রকাশক, কিন্তু তাঁর উচ্ছ্বসিত আবেগ কখনোই বিহারীলালের ব্যাকুলতায় ধ্বনিত নয়। আধারাশ্রয়ী সৌন্দর্যবোধ বিহারীলালে যে অনির্দ্দেশ্য সৌন্দর্য ব্যাকুলতায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, দেবেন্দ্রনাথে তাব অভাব বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃত কবিজীবনের প্রতিষ্ঠার আগেই রবীন্দ্রনাথ বললেন যে তাঁর কবিতায় সুখদুঃখবিবহমিলনপরিপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তা তিনি ঠিক করে বলতে পারেন না অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে রূপময় সৌন্দর্যের অনুধ্যানেও দুই মানসিকতা। বিহারীলালে যার সূচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে তার বিস্তার ও পবিণাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রকালীন হলেও রবীন্দ্রপূর্ববর্তী রূপেই গৃহীত হবেন, কাব্য-উচ্চারণপদ্ধতির দিক থেকে তো বটেই, সৌন্দর্য ভাবনার দিক থেকেও।

'আমি পুরাতন 'স্কুলের'—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি।' নিজের কবি-পরিচয়ের ব্যাখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ যে এই উক্তি করেছিলেন, তা আমরা অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের স্মৃতিকথামূলক রচনা থেকেই জানি। এখানে মাইকেল-হেমচন্দ্রের 'স্কুল' দেবেন্দ্রনাথ পুরাতন বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নূতন না থাকলে পুরাতনের পরিকল্পনা হয় না, এবং তিনি নূতন 'স্কুলের' কথা কিছু বলেন নি। কামিনী রায় স্পষ্ট করেই রবীন্দ্র প্রবর্ত্তিত নূতন স্কুলের কথা বলেছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এখানে একটা অন্তরাল রাখলেও বিহারীলাল প্রবর্ত্তিত কাব্যাদর্শের পরিণামে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা কাব্যে যে নূতন স্কুলের পত্তন হয় তার ইঙ্গিতটিকেই এখানে অনতিস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। কাজেই তিনি যখন নিজেকে পুরাতন স্কুলের কবি বলেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে তা এই অর্থেই সত্য যে রবীন্দ্র-স্কুলের যোগ্য শরিকানা তিনি অর্জন করতে পারেন নি ; নতুবা তিনি যে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের পুরাতন স্কুলের কথা বলেছেন, তার প্রকৃতিগত সামীপ্য তাঁর কবিতায় খুব গুরুতর ভাবে লক্ষণীয় বলেও মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে হেমচন্দ্র বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বলে অনেকেই মনে করতেন। যদুনাথ সরকার 'দুই রকম কবি: হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' নামে 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দুই কবির বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করে মোটামুটিভাবে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে দুই কবির ভিন্নতা প্রকৃতিগত। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধে তিনি নূতন যুগের কবি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে যে হেমচন্দ্রের মানকে ব্যবহার করলেন, তা প্রমাণ করে যে রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কবিতায় হেমচন্দ্রই ছিলেন গুরুতর কবিব্যক্তিত্ব। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দেই রাজনারায়ণ বসুও জানিয়ে গিয়েছিলেন যে হেমচন্দ্র তখন সাধারণ বিবেচনায় 'সর্বপ্রধান কবি' ছিলেন। স্বভাবতই হেমচন্দ্রের কাব্যাদর্শ দেবেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে হয়।

বৃত্রসংহারের রচয়িতা হলেও হেমচন্দ্রের কবিত্ব ও কাব্যভাবনা মধুসূদন-অনুসারী নয়; তাঁর কবিতায় শিল্পচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার অনটন সহজেই চোখে পড়ে। রঙ্গলালের কাব্যপ্রেরণায় যে জাতীয়তাবোধের উচ্ছ্বাস ছিল, হেমচন্দ্রের কবিতার নিয়ামক শক্তি তা ই। কামিনী রায় লিখছেন: 'তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি, নারী জাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ—এ সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।' এই প্রসঙ্গকেই বোধহয় একটু ঘুরিয়ে যদুনাথ সরকার বলতে চেয়েছিলেন: 'তাঁর সামাজিকতা'। সামাজিকতা বলতে তিনি ইংরেজীতে Collectivisim বোঝাতে চেয়েছেন। সামাজিকতাই হেমচন্দ্রের কবিতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, একধরণের সমষ্টিচৈতন্য তাঁর কবিতায় অকপটভাবে উপস্থিত। যদুনাথ সরকার বিষয়টিকে এইভাবে উপস্থিত করেছেন: 'তাঁহার প্রতি ছত্রে দেখা যায় যে তিনি সর্বদা মনে রাখিতেন যে তিনি জনসমষ্টির মধ্যে একজন; যেন এ জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে একা দাঁড়াইয়া নীরবে অন্যসব লোককে দেখিতেছেন, এরকম তাঁহার মনের ভাব নহে।' যদুনাথ-উক্ত এই সামাজিকতা যদি collectivism হয়, তবে তার বিপরীত শব্দ individualism বা এককত্ব। এখন স্বাভাবিক ভাবেই এই জিজ্ঞাসা উঠতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই সামাজিকতা বা সমষ্টিচৈতন্যের অধিকার কতটুকু ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে হিন্দু গার্হস্থ্যজীবন-মনস্কতা দেবেন্দ্রনাথের কবিতার কেন্দ্রভূমি। এর মধ্যে একটি সামাজিক মনের উৎসার সহজেই লক্ষণীয়। গার্হস্থ্য জীবনের সত্য, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে এক প্রীতিস্নিগ্ধ

মমতায় তিনি উদ্ধার করতে চেয়েছেন; দেখতে চেয়েছেন তার সৌন্দর্য, কখনো অন্তর্গত হয়ে, এবং অধিকাংশ সময়েই সামান্য ব্যবধানে দাঁড়িয়ে। সমস্ত আয়োজনের মধ্যে রোমান্টিক লক্ষণটি চিনে নেওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যালোকে দীপিত ও উদ্বোধিত হৃদয়ে নব-উন্মেষিত আনন্দ ও বিস্ময়ের চোখ দিয়েই বাঙালী কবিরা সেদিন গার্হস্থ্য-জীবনের আপাত তুচ্ছতার মধ্যে বাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেছিলেন। এই সৌন্দর্য্যকেই আশ্রয়ভূমিরূপে অতঃপর তাঁরা নিরূপণ করে নিয়েছিলেন। নবজাগরণের দিনগুলি যখন জীবনকে বহুমুখী আয়োজনে উদ্দীপিত করে, জীবনকে বাইরের দিকে প্ররোচিত করে, তখন আমাদের সনাতন জীবন প্রবাহের মধ্যে যে গার্হস্থ্য জীবন নির্ভর শান্ত স্থির কেন্দ্রভূমিটি আছে, তাকেই আশ্রয়ভূমি রূপে চিনে নেবার চেষ্টাই যেন এই ধরণের কবিতার মধ্যে দেখা যায়। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'গীতিকা' কাব্যের 'সেকাল ও একাল' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এই কবিতায় গার্হস্থ্য জীবনকোণের অনুভূতিটিকে 'সোনার বাসন' বলা হয়েছে, যা সেকালের; আর যা একালের তাকে বলা হয়েছে 'কঠোর কর্তব্য আর শাণিত শাসন'। অর্থাৎ, শান্ত স্নিগ্ধতা যা প্রাণময় বনাম অনুভূতিহীন বহিরঙ্গ আচরণ। সব মিলে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে রোমান্টিক কল্পনাবৃত্তিই এই ধরণের কবিতা রচনার প্রেরণাভূমি।

ফলে collectivism অর্থে সামাজিকতা নয়, বরং রোমান্টিক কল্পনা ব্যক্তি-শায়ী বলেই এই ধরণের কবিতার মধ্যে individualism বা কবির ব্যক্তিগততার পরিচয়চিহ্নই সুস্পষ্ট। দেবেন্দ্রনাথের গার্হস্থ্য জীবনমনস্কতাকে সমষ্টিচৈতন্যের আলোকে দেখবার কোন কারণ নেই, সমস্ত ব্যাপারটিই এখানে রোমান্টিক বাসনার নির্মাণ। হতে পারে, কখনো হঠাৎ সামাজিক বা লোকাচার জনিত সংস্কারের বিরোধিতায় দেবেন্দ্রনাথের সচেতন আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ' কবিতায়, যেখানে নারীর প্রতি অবহেলাই বাঙালির অধমতার কারণ বলে তিনি নিরূপণ করেছেন। কিন্তু সেখানেও কবির মূল অভিপ্রায় নারীকে সৌন্দর্যের আধার রূপে প্রতিষ্ঠায়, যে নারীকে বিশ্বের 'শৃঙ্খলা', 'বিধাতার মানস মোহিনী' কবিতারূপে তিনি লক্ষ্য করেন। বস্তুত দেবেন্দ্রনাথের কবিচেতনা রোমান্টিক প্রকৃতির বশীভূত, যার মধ্যে ব্যক্তিঘনিষ্ঠ উপলব্ধির প্রকরণটি চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

অবশ্য এই অনুভূতি বা উপলব্ধির মাত্রাভেদ সম্ভব। যদুনাথ সহজভাব ও সূক্ষ্মভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ primary feeling ও secondary feeling-এর কথা বলেছেন। কোলরিজও কল্পনাকে দুটো ভাগেই ভাগ করে

দেখাতে চেয়েছিলেন—primary imagination ও secondary imagination. হেমচন্দ্রের কাব্যে যদুনাথ এই সহজ ভাব বা primary feeling এর অভিব্যক্তি দেখেছেন, যা অতি সরল অতি সনাতন; এবং রবীন্দ্র কাব্যের ভাবপরিচয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: 'এখন আমরা আর প্রাথমিক মনোবৃত্তিগুলির দ্বারা বড় একটা পরিচালিত হই না, এখন সূক্ষ্মতর ভাবগুলি (secondary feelings) আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করে, সুতরাং এখনকার কবির কাজ বড়ই কঠিন।' সন্দেহ নেই, এই ধরণের ব্যাখ্যা অনেকেই অত্যধিক সরলীকরণের দায়ে বদ্ধ করবেন। কোলরিজ secondary imagination বলতে সাধারণ ভাবে উচ্চতর কল্পনা শক্তিকেই বুঝিয়েছিলেন, তার সমীকরণ-শক্তির উপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু খুব স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে Secondary imagintion অবশ্যম্ভাবীরূপে primary imagination-এর উপর নির্ভরশীল। যদুনাথ সবকার বিস্ময়কর-ভাবে এই নির্ভরশীলতার সূত্রটিকে উপেক্ষা করে গেছেন। সূক্ষ্মতর ভাব প্রাথমিক অনুভূতিনিরপেক্ষ নয়, রবীন্দ্রকবিতা প্রাথমিক অনুভূতির স্তরের ওপর দাঁড়িয়েই তাকে উচ্চতর ভাবোপলব্ধির ভূমিতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের অবস্থান একটু বিশেষ ধরণের। তখন পর্যন্ত হেমচন্দ্র প্রবলভাবে প্রভাময়, অথচ রবীন্দ্রনাথও অনিবার্যভাবে উপস্থিত। সমকালীন অনেক কবির মতই দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবে একধরণের দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অনুভূতি সাধারণভাবে প্রাথমিক স্তরের; দয়া, প্রেম, স্নেহ ইত্যাদি প্রাথমিক বোধগুলিই অবিকৃত, অমিশ্র, সহজ ও চিরন্তনতার ভিত্তিতে তাঁর কাব্যে জয়ী হয়েছে. সূক্ষ্মতর উচ্চ ভাবতাৎপর্যে সেগুলিকে উত্তীর্ণ করার উদ্যম তাঁর কবিতায় খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। এরই মধ্যে কোথাও কোথাও এই ভাবগুলিকে আদর্শায়িত করবার আগ্রহে তিনি নিবেদিত; কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত আয়োজনের মধ্যে এক ধরণের কৃত্রিমতা প্রায় চোখে ধরা পড়ে, তাঁর সমস্ত উদ্যমশীলতা আরোপ-তৎপর ও বহিরঙ্গ বলে মনে হয়। কবি কল্পনার মধ্যে সেই সমীকরণ-শক্তির অভাবই তাঁর কবিতাকে মৃত্তিকাগন্ধ থেকে পারিজাত-গন্ধে মুক্তি দিতে পারে নি।

তাঁর কল্পনা সাধারণভাবে বিষয় আশ্রিত। বিষয়ই ভাবের উদ্বোধক, কিন্তু উদ্বোধিত ভাবের জগতে তিনি সর্বব্যাপী স্বস্তি অনুভব করেন না, বার বার ফিরে পেতে চান উদ্বোধনের ভূমিকে অর্থাৎ বিষয়কে। কিন্তু কখনো কোন কবিতায় যখন তিনি ভাবতন্ময়তায় নিমগ্ন হয়ে যান, তখনো ভাব জগতের অন্তহীন বিস্ময়

ও চমৎকারিত্ব স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় প্রতিশ্রুত করতে পারেন না, এক পরিশ্রম-সাধ্য ক্রিয়াকাণ্ড রূপে সমস্তটা প্রতিভাত হয়। আবেগের অতিরেক অনেক সময়ই রোমান্টিক কবিতার অপকর্ষের কারণ না হয়ে কবিকে আত্ম-প্রকাশের দূরবিস্তারী সম্ভাবনায় উত্তীর্ণ করে দেয়, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় যে এই ধরণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় হয় না, তা বোধহয় অনেকেই স্বীকার করবেন। এর কারণ কি তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উচ্চারণ যে এর জন্য অনেকখানি দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবির আত্মপ্রকাশ এতখানি ভাষানির্ভর যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার ওপর কবির যোগ্যতা নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সমাসোক্তি এবং প্রাথমিক স্তরের উপমা অলংকার তিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। এবং কখনো কখনো তার বাঞ্ছিত ফললাভ হয়েছে, পংক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এক ধরণের প্রবহমানতার বেগ কোথাও কোথাও প্রতিশ্রুত, কিন্তু বিবেচকমাত্রেই আমাদের এ-কথা বার বার জানিয়ে গেছেন যে শব্দকে অর্থবদ্ধতার পবিণাম থেকে মুক্ত করতে না পারলে সমস্তটাই পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়ায়। কবিব শক্তি ধরা পড়ে তাঁর শব্দকে অর্থ-অতিক্রমী সত্তায় ব্যবহারে এবং নূতন শব্দ রচনার দক্ষতায়। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দ শব্দ মাত্র, শব্দার্থকে বাহিরঙ্গ দেহ-সৌকুমার্যে স্থাপন করেই তিনি সন্তুষ্ট, এর অধিক সম্ভবত তাঁর বাসনার অন্তর্গত ছিল না।

হেমচন্দ্র মেঘনাদবধ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। ১৮৭৪-এর পরিবর্তিত ভূমিকার কথা থাক, কিন্তু আমরা জানি যে ১৮৬২তে যখন তিনি এই কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন তিনি এই কাব্য ও মধুসূদন সম্পর্কে যোগ্য বিবেচনায় আত্মগঠিত হয়েছিলেন না। ঐ আলোচনায় মধুসূদনের উপমা-উৎপ্রেক্ষা, পদবিন্যাস বা ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে কোন বড় রকমের সূক্ষ্মদর্শিতা নেই। কিন্তু ঐ আলোচনার মধ্য থেকেই কবিতার ভাষাগত প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মনস্তত্বটি ধরে নিতে কষ্ট হয় না। তিনি ভারতচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েও মধুসূদনের ব্যবহৃত শব্দের বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবের সঙ্গে তার আন্তর সৌন্দর্যের সত্য কেন লক্ষ্য করলেন না, তা বোঝা কঠিন। মধুসূদন অবশ্য সব সময় শব্দার্থক্রমী সত্তায় শব্দ ব্যবহারকে সার্থক করে তুলতে পারেন নি, তথাপি শব্দকে মৌলিক অর্থে প্রয়োগ করে অনেক সময় কবিতায় তিনি যে শব্দ-ব্যবহারের যোগ্যতাকে তর্কাতীত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্রের কবিতায় শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য

শিল্পকৌতূহলের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়, শব্দকে শব্দার্থবন্ধন থেকে তিনি মুক্ত করতে পারেন নি, কবিতার দেহগত উপাদানমাত্র রূপে লক্ষ্য করে শব্দ-সন্ধান বৃত্তিকে তিনি উল্লেখযোগ্য হতে দেননি। শব্দকে যে শক্তি সঙ্গীত করে তোলে, উনিশ শতকীয় কবিতায়, কয়েকটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র বাদ দিলে, তার বড় একটা পরিচয় নেই। এমনকি বিহারীলালও কখনো কখনো এই শক্তির অব্যর্থ উদাহরণ সৃষ্টি করেও সামঞ্জস্যবোধের অভাবে অথবা যথেষ্ট মনস্কতার অভাবে, সাধারণভাবে ভাষা-প্রকরণে এক ধরণের বিভ্রাট তৈরী করে গেছেন।

রবীন্দ্র প্রবর্তিত নূতন 'স্কুলের' অনুবর্তী নন, এই অর্থে দেবেন্দ্রনাথ পুরাতন 'স্কুলের' কবি বলে নিজের পরিচয় উপস্থিত করতে পারেন, তথাপি তাঁর কবিতায় নির্দিষ্টভাবে হেমচন্দ্রের স্পর্শটি ঠিক কোথায়, তা নির্ধারণ করা শক্ত। মনে হয়, যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গে হেমচন্দ্রের কথা তিনি নিজের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন নি। রবীন্দ্র পূর্ববর্ত্তী কাব্যধর্ম ও রীতির সঙ্গে তাঁর যোগ, হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগ প্রমাণ করে না। নতুবা উনিশ শতকীয় বাংলা কবিতাকে হেমচন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বলে উল্লেখ করতে হয়, যা সম্ভবতঃ বিবেচকদের অসংকোচ অনুমোদন পাবে না। দেবেন্দ্রনাথের আবেগের তীব্রতা ও অপরিমেয়তা বরং অনেক সময় বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্রের প্রতিবেশী রূপে তাঁকে লক্ষ্য করবার একটা প্রবণতাকে জাগ্রত করে তোলে।

৩

'অপূর্ব বীরাঙ্গনা'য় দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনের প্রতি গুরু-প্রণাম নিবেদন করে-ছিলেন। 'মাইকেলই আমার গুরু'—তাঁর এই ঘোষণাধর্মী স্বীকৃতির কথাও অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত আমাদের জানিয়ে গেছেন। মোহিতলাল মজুমদারও দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় মধুসূদনের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। সব মিলে দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিবেচনায় মধুসূদনের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উত্থাপনযোগ্য হয়ে ওঠে।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে দেবেন্দ্রনাথে মধুসূদনের প্রতি আনুগত্যের কিছু কিছু পরিচয় আছে। ১৮৮০-তে প্রকাশিত তাঁর 'ঊর্মিলা কাব্য' স্পষ্টতই মধুসূদনকে স্মরণ করায়। তাঁর অসম্পূর্ণ 'দশানন বধ'ও মধুসূদনের আচ্ছন্নতার প্রমাণস্থল। তিনি যখন 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' বা 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' রচনা করেন, বিশ শতকেও তখন তিনি কাব্যের নামকরণে মধুস্মৃতিকে বহমান রেখেছিলেন। মধুসূদনকে গুরুরূপে স্বীকৃতির পরিপোষক তথ্যরূপে এই সব তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু মনে হয়

এগুলি নিতান্তই বহিরঙ্গ, মধুসূদনের সঙ্গে কবির অন্তঃপ্রকৃতির বা কাব্যভাবনার যোগ এই তথ্যাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। নারীর রূপ-সৌন্দর্যে তিনি যে সৌন্দর্য-তীর্থ রচনা করেছিলেন, মধুসূদনের বা ·হেমচন্দ্রের কবিভাবনার কেন্দ্রসত্য রূপে তা কখনোই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। রূপের প্রতি মধুসূদনের এক ধরনের মানসিক প্রবণতা ছিল অবশ্য, তিনি কাব্যের রূপতত্ত্বে যে সদা জাগ্রত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি নারীর রূপও তাঁর কল্পনাকে যে উত্তেজিত করেছে, রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি তাঁকে যে গভীরভাবে মনস্ক করে তুলেছে, 'তিলোত্তমা সম্ভব' থেকে 'বীরাঙ্গনা' পর্যন্ত তার সমর্থনমূলক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর এই রূপ-সৌন্দর্য চেতনা ঐশ্বর্যচেতনার সমাথক রূপেই আত্মপ্রকাশ করে, যা তাঁর কবি-প্রকৃতির অন্যতম উপাদানস্বরূপ মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ পক্ষান্তরে নিজেকে 'রূপের পূজারী' বলেছেন, 'রূপ-পূজা পুরোহিত' বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন ; অর্থাৎ এই রূপারতিই দেবেন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়। যখন তিনি নারীর রূপ-সৌন্দর্যে নিমগ্ন হন অথবা বাঙালির গার্হস্থ্য সৌন্দর্যে অবগাহন করেন, সর্বত্রই রূপতন্ময়তা যে তাঁর অন্তঃপ্রকৃতিব পরিচয়চিহ্ন-বহনকারী শক্তি তা বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

আর এই রূপতন্ময়তাকে রূপমুগ্ধতা বললেও অন্যায় হয় না। অনুভূতির আনন্দময়তা থেকেই এই মুগ্ধতার সৃষ্টি। বিষয়কে সহর্ষ প্রসন্নতায় দেখতেই তিনি অভ্যস্ত, তাঁর ব্যাকুলতা 'লক্ষৌব আতা'ব মতো চঞ্চল উল্লাসে ভেঙে পড়ে। কিন্তু মধুসূদনেব কবিতায় বেদনা ও বিষাদের এক সর্বব্যাপী হাহাকারধ্বনি শোনা যায় ; তাঁর আত্মপর্যালোচনামূলক কবিতাতেই হোক, আর রূপায়িত চরিত্রের আত্ম-প্রকাশেই হোক, হৃদয়ের রক্তক্ষরণের ইতিহাস তাতে সঞ্চিত আছে। রাধা-বিরহের কথা বাদ দিলেও তাঁর অনেকগুলি বীরাঙ্গনা চরিত্রের আত্মঘোষণার পেছনে যে বেদনার অংশ আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভালোবাসা সে একটি বেদনাময় অভিজ্ঞতা—তা যে পরিচয়েই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন—এক গভীর সংবেদনায় মধুসূদন তা নিরূপণ করে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিষাদ ও বেদনার বোধ মধুসূদনের কবিতার প্রকৃতিগত এক গুরুতর উপাদান, দেবেন্দ্রনাথে যা সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত বলা চলে। নানা নামে ভালোবাসাকেই তিনি দেখেছেন তাঁর কবিতায়, সে দ্রৌপদীর শাড়ীর মতোই অন্তহীন, ও তার প্রকাশ জ্যোৎস্নাময়। 'অশোকগুচ্ছের' 'প্রিয়তমার প্রতি' কবিতায় যখন তিনি বলেন 'নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে, আধ গ্ল্যাস জল যেন নিদাঘের কালে' —তখন তিনি বহিরঙ্গ অভাবাত্মকতাকে নিতান্তই এক গদ্যধর্মী প্রত্যক্ষভাষণে ধারণ করেন মাত্র,

রোমান্টিক বেদনার স্পর্শে অনুভূতিকে তিনি ব্যাকুল করে তোলেন না। হয়তো তা তাঁর অভিপ্রায়ের অন্তর্গত নয়, কিন্তু যে কোনও রকমের বেদনাবোধ থেকেই যে বাণীর উচ্চারণ, দেবেন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে গিয়ে অনেক সময় তাঁর এই সজ্ঞানতার অভাবে অস্বস্তির বোধ হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ 'নীরব কবি'র যোগ্যতাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, কিন্তু যে কবি নিরশ্রু তাঁর সম্পর্কে কোন বিবেচনা করেন নি।

মধুসূদনের কাব্যভাষার প্রভাব দেবেন্দ্রনাথে বোধহয় শেষ অবধি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা পয়ার ছন্দকে যে দূরবিস্তারী সম্ভাবনায় মধুসূদন মুক্তি দিয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অধিকার অর্জন করেই তুষ্ট ছিলেন; তাঁর কাব্যসাধনার কালেই বাংলা ছন্দের বিচিত্র আত্মপ্রকাশের উল্লাসে তিনি নিজকে দীপিত করতে চান নি। তিনি আগাগোড়া কবিতা লিখে গেলেন মূলতঃ একটি মাত্র ছন্দে: অক্ষর-বৃত্তে। মধুসূদন প্রবর্তিত প্রবহমানতার বেগটি তিনি অনেকাংশে আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলেই এক ছন্দভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতা প্রাগাধুনিক ক্লান্তি-করতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। মোহিতলাল জানিয়েছেন যে তাঁর মুখে 'মেঘনাদবধের' আবৃত্তি শুনেই তিনি প্রথম বাংলা অমিত্রাক্ষরের মাধুরী উপলব্ধি করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্টই অমিত্রাক্ষরে আগ্রহ দেখাননি, কিন্তু তিনি এই ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতির সত্যটিকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিলেন, বুঝেছিলেন প্রবহমানতার বেগ, ধ্বনিসঙ্গীত সৃষ্টির প্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য সুবিধে। তবু বহিরঙ্গেও কোথাও কোথাও দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় মধুসূদনের স্পর্শ উপস্থিত। মধুসূদনের অনুপ্রাসের ভঙ্গি যে তার কবিতায় প্রচুর পরিমাণে আছে, মোহিতলাল তো তা উদাহরণ দিয়েই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া সম্বোধন-বাচকতায় অর্থাৎ সম্বোধন-বাচক পদ বা পদান্বয় ব্যবহারে অথবা অনুভূতির আশ্চর্যবোধক উচ্চারণে দেবেন্দ্রনাথের যে অবাধ রুচি, তা অনেক সময়ই মধুসূদনকে মনে করিয়ে দেয়। কাব্যদেহে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ভাবের বিভঙ্গ ব্যাখ্যায় মধুসূদনীয়রীতির অনুসরণও দেবেন্দ্রনাথে প্রচুর পরিমাণেই দেখা যাবে।

কিন্তু মধুসূদন সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথে সমুজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত সনেট আঙ্গিকের অনুবর্তনে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সনেটের ইতিহাসে মধুসূদনের পরেই দেবেন্দ্রনাথের নাম করতে হয় গুরুত্বের বিবেচনায়। মধুসূদন আদি সনেট রচয়িতা পেত্রার্কার আদর্শ অনুসারী ছিলেন, শেক্সপীয়রীয় রীতির প্রতি তাঁর অনাগ্রহ সাধারণভাবে পরিচিত। কিন্তু বিদেশী সাহিত্য থেকে এই বিশিষ্ট কাব্য-আঙ্গিককেই বাংলা-

সাহিত্যে তিনি উপহার দিতে চেয়েছিলেন, এবং তাঁর রচনা যে গভীর সচেতনতার ফসল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা হতেই পারে যে অনেকগুলি ক্ষেত্রে সনেটের রূপ নির্ণয়ে তাঁর শাস্ত্রীয় ত্রুটি থেকে গেছে, কিন্তু তাঁর হাত থেকেই বাংলা কবিতা একটা বিশিষ্ট রীতিতে অধিকার অর্জন করেছিল। তথাপি বাংলা কবি ও কাব্য-বিবেচকরা এই রূপরীতি সম্পর্কে সেই সময় যে স্বচ্ছ ধারণার বশবর্তী হতে পারেন নি, তার পরিচয়ও যথেষ্ট। ১৮৭০-এ হেমচন্দ্রের 'কবিতা-বলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে ক্যালকাটা গেজেটে গ্রন্থখানিকে একটি সনেটের বই এবং গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলিকে সনেট বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। ভ্রান্তি কতখানি অসহায় হতে পারে, এথেকে তা বোঝা যায়; কিন্তু পাশাপাশি একথা মেনে নিতে অসুবিধে হয় না যে সনেট বলতে আকারে ছোট খণ্ডকবিতাকেই তখন সাধারণভাবে নিরূপণ করা হয়েছিল। কবিরাও যে সনেট সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী সচেতন ছিলেন, তা মনে হয় না। সেই সময়কার বিশিষ্ট কবিরা এই রূপবন্ধের প্রতি উদাসীন ছিলেন বটে, গৌণ কবি যাঁরা চতুর্দশপদী চর্চায় নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাঁরাও 'চতুর্দশপদী' শব্দবন্ধটি যে 'সনেট'-এর পরিভাষামাত্র, তা জানতেন না। চতুর্দশ পদে সমাপ্ত কবিতাই তাঁদের কাছে 'চতুর্দশপদী' রূপে বিবেচিত হতো। রামদাস সেনের 'চতুর্দশপদী কবিতামালা' (১৮৬৭) স্পষ্টতই গ্রন্থের নামকরণে মধুসূদন-অনুকারী; বিষয় নির্বাচন বা শব্দ ও বাক্যাংশ যোজনায়ও মধুসূদনের প্রভাব অপরিমাণ। একটি চতুর্দশপদীতে তিনি মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন, তার শেষ লাইন কটি এই রকম:

> "নবরসে প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
> কাব্য-প্রিয় বাঙ্গালির যাহে শুন্মে প্রীত॥
> কাব্যের কানন দিকে পুনঃ কর্ণ ধায়।
> শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়॥"

এখানে চোখেই ধরা পড়ে যায় যে রামদাস নিতান্তই 'পয়ার প্রবন্ধ' রচনা করে গেছেন, কোন দিক থেকেই এতে সনেটের আদর্শের প্রতি তাঁর মনোযোগ প্রমাণিত হয় না। অষ্টক ষট্ক-এর চেতনার কথা দূরে থাক, মিল বিন্যাসের অনুশাসনও এখানে গ্রাহ্য করা হয়নি, এবং কবি বাংলা পয়ারের মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর সংস্কারের কাছে এমন দ্বিধাহীন ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন যে এমন কি দাঁড়ি, ডবল দাঁড়ি ব্যবহারের প্রথাকেও স্খলিত হতে দেন নি। উৎকলবাসী কবি রাধানাথ রায় তাঁর 'কবিতাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড)-তে ১২৮০ বঙ্গাব্দে যে চতুর্দশপদী কবিতাগুলি প্রকাশ

করেন, তাতে রামদাসের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় আছে বলে মনে হয় এই কারণে যে তিনি রামদাসের মতো সাতটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর সমবায়ে চতুর্দশপদী রচনা করেন নি এবং মিলের ক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা মনোযোগ দেখাতে চেষ্টা করেছেন। 'চতুষ্ক' সম্পর্কিত কোনো সচেতন ভাবনা যেমন তাঁর মধ্যে দেখা যায় না, তেমনি ঐ মিলের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনাহীন স্বেচ্ছাচারিতাই দেখিয়ে গেছেন যাকে কবির স্বাধীনতার দিক থেকে ব্যাখ্যা করা অসমীচীন হবে। রাজকৃষ্ণ রায় 'বঙ্গভূষণ' (১২৮০)-এ বলেছেন, 'মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বঙ্গভাষায় প্রথম সৃষ্টি চতুর্দশপদী কবিতার অনুকরণ করিয়া বঙ্গভূষণ রচনা করিলাম।' মধুসূদনকে অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি হয়তো অংশত যোগ্যতা দেখাতে পেরেছেন, কিন্তু পেত্রার্কীয় রীতির ক্ষেত্রে তাঁর অসহায়তা বিশেষ ভাবেই স্পষ্ট। অবশ্য শেক্স-পীয়রীয় রীতির ক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতা কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকবেন। রামদাস বা রাধানাথের তুলনায় রাজকৃষ্ণের চতুর্দশপদী বিষয়-বৈচিত্রের অভাবে ক্লান্তিকর, ব্যক্তিমহিমা বর্ণনার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ, মিলের ক্ষেত্রেও তিনি যে বিচিত্রতার পরিচয় রেখেছেন, তা সাধারণভাবে বিশৃঙ্খলতারই উদাহরণ। তবে এই ক্ষেত্রে একটা মনস্তত্ত্ব অন্তত পরিষ্কার হয়ে যায় যে চতুর্দশপদী রচনার ক্ষেত্রে এঁরা কোন বিদেশী রীতিকেই শাস্ত্র হিসেবে অনুমোদন করেন নি। কবিতার দিক থেকে এই লক্ষণটি যখন প্রশংসাযোগ্য তখনও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাদের রচনার পেছনে কোন সচেতন নূতন পরিকল্পনা ছিল না, অথচ শিল্পের দিক থেকে পরিকল্পনাগত উদ্ভাবনী শক্তি যদি না থাকে তাহলে পূর্বাদর্শকে উপেক্ষা করার মধ্যে কোন শক্তি ধরা পড়ে না, বরং তা শৃঙ্খলাহীন স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। শিল্প-বিবেচনার দিক থেকে এই রকম অবস্থা কোন দিক থেকেই প্রশংসনীয় নয়।

মধুসূদন-অনুকারী বাংলা চতুর্দশপদী কবিতা লেখকদের এই অমনোযোগী শিথিলতার গ্রাস থেকে দেবেন্দ্রনাথই বাংলা সনেটকে অনেকাংশে উদ্ধার করেছিলেন। একটি বিশিষ্ট রূপবন্ধকে মধুসূদন যে শিল্প-প্রেরণার দিক থেকেই বাংলা কবিতায় চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ মোটামুটিভাবে তার তাৎপর্য ধরতে পেরেছিলেন, এবং এদিক থেকে একটি শিল্প-আঙ্গিকরূপে সনেটরীতির চর্চায় দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনের যথার্থ উত্তরাধিকারী। মধুসূদনের পরেও রবীন্দ্র-সমকালে সনেটের রচয়িতা রূপে তাঁর যোগ্যতা স্বীকৃত হয়েছে। তিনি মধুসূদনের মতো পেত্রার্কীয় আদর্শের প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন না, নিখুঁত পেত্রার্কীয় রীতির

সনেট তার নেই বললেই চলে। কিন্তু নিখুঁত শেক্সপীয়রীয় রীতি অনুসরণ করে তিনি কিছু উল্লেখযোগ্য সনেট লিখেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য অনেকগুলি সনেটের ক্ষেত্রেই তিনি মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা নিয়েছিলেন, দ্বিপদী ও চতুষ্ক গঠনেও কখনো অন্যমনস্কতা দেখা গেছে। অষ্টকে পেত্রার্কীয় রীতির সঙ্গে ষট্‌কে শেক্সপীয়রীয় রীতির যোগে, অথবা কোথাও প্রথম চতুষ্কে পেত্রার্কীয় রীতি বজায় রেখে পরে শেক্সপীয়রীয় রীতির অনুবর্তন করে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সনেটে প্রায়ই এক ধরণের মিশ্রতার সৃষ্টি করে গেছেন। এই ক্ষেত্রগুলিতে বেশ বোঝা যায় যে তিনি আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নূতন পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন। রামদাস, বাধানাথ বা বাজকৃষ্ণ রায়ের বিশৃঙ্খলা থেকে এর চরিত্র অবশ্যই আলাদা। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ কখনোই গুরুতরভাবে মনোযোগী ছিলেন না, তিনি বাংলা কবিতাকে যেভাবে পেয়েছিলেন তার মধ্য দিয়েই তিনি পথ চলেছেন, কোন নূতন উদ্ভাবনায় প্রকাশরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান নি। বড় শিল্পীর দিক থেকে এটা কৃতিত্বের সূচক নয়, তথাপি সনেটের ক্ষেত্রে তাঁর এই পরীক্ষামূলকতা শিল্প সন্ধানের তাৎপর্যেই লক্ষণীয় বলে মনে হয়। এর কারণ স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগের ক্ষেত্রে, মিল-বিন্যাসের ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথ উনিশ শতকেই বাংলা সনেট রচনায় যে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন, তাব সঙ্গে পরিচয় দেবেন্দ্রনাথেব ছিল। ববীন্দ্রনাথ সনেটের প্যাটার্ণকে তাঁর প্রয়োজনেব অনুগত করেছিলেন, নিজেব অনুভূতিকে প্যাটার্ণের আনুগত্যে সমর্পণ করেন নি। বড় কবির এই শক্তি ও প্রত্যয় দেবেন্দ্রনাথের ছিল না, দেবেন্দ্রনাথ প্রথাগত আঙ্গিকের অনুসরণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। শুধু নির্দিষ্ট প্রকরণের মধ্যে থেকে মিল-বিন্যাসের ক্ষেত্রে কখনো কখনো প্রথাগত বিধানকে লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে পরীক্ষাধর্ম থাকলেও তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং সাধারণভাবে তা কৌতূহলের সীমাকে কখনোই অতিক্রম করে যায় নি।

মধুসূদনের পরেই দেবেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট সনেট-লেখক, তবু সনেট তাঁর আত্ম-প্রকাশের যথার্থ মাধ্যম ছিল কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাঁর কবি-স্বভাবের দিক থেকে দেখলে এই প্রশ্নের স্বাভাবিকতা বোঝা যায়। তাঁর রোমান্টিক ভাব-কল্পনার মধ্যে তীব্র আবেগ ও উচ্ছ্বাসপরিপূর্ণ উৎফুল্লতা ছিল, অনেকেই তাঁর এই বেগবান আবেগের মধ্যে সংযমের অভাব লক্ষ্য করে থাকবেন। এই ধরণের অনুভূতির উচ্চারণের জন্য বহিরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ কর্মই প্রয়োজন, যা নদীর মতো অনুভূতির প্রবাহকে বহমান রাখতে পারে। সংযমের ব্যাপারটা বাইরের নিয়ন্ত্রণের

ওপর নির্ভরশীল হলে সমস্ত আয়োজনের মধ্যে এক ধরণের কৃত্রিমতা এসে যায়, সংযম স্বভাবতই একটি চিৎ-ক্রিয়া। উচ্চতব কল্পনার মধ্যে একটি সংশ্লেষণী শক্তি আছে, এই শক্তিই আবেগ ও অনুভূতিকে সংযত করে। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অসংযতভাবে উচ্ছ্বাসপূর্ণ আবেগকে সনেটের বন্ধনে স্থাপন করে উপকৃত হয়েছিলেন বললে এক ধরণের মনোভাব প্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু তা পক্ষান্তরে কবির শক্তির ওপর একটি ভৎর্সনা রেখে যায়। শিল্পের সংযম বাইরের জিনিস নয়, ভিতরের জিনিস, এই সংযত ভিতরই সংযত বাহিরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্প-প্রতিমা তৈরী করে, সনেটেব শিল্প-প্রতিষ্ঠাও এই সূত্রেই লক্ষণীয় হওয়া উচিত।

এবং দেবেন্দ্রনাথ তার আবেগময় অনুভূতির কূলপ্লাবিতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সনেটেব বন্ধন যে অনুভতির এই প্লাবন ধাবণ করবার উপযুক্ত নয়, এ-সম্পর্কে তাঁব মনোভাব তিনি আড়াল কবেন নি। 'প্রিয়তমাব প্রতি' কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন,

কে যেন গো কানে কানে কহিছে সোহাগে -
"আন থালা; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়"?
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে।
বন্দী হযে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে,
কাঁদে যথা সুকবিতা, গুমরে গুমরে,
মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ-আঁধারে,
তোমার ও মুখশশী কাঁদিছে কাতরে; -

এখানে দেখা যাচ্ছে দেবেন্দ্রনাথ সনেটকে 'সুকবিতা'র 'রোদন আগার' মনে করেছেন, অন্তবিহীন অনুভূতি যাপনের জন্য চাই বন্ধনহীন মুক্তি, প্রিয়াকে কবি তাই মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, যেখানে—অদূরে তটিনী, 'দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী।' এই 'দ্রৌপদীর শাড়ী' শব্দবন্ধটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। তাহলে চাই এমন একটি আধার যা অন্তহীন আবেগকে ধারণ করতে সক্ষম। অথচ তথাপি দেবেন্দ্রনাথ সনেটের রূপবন্ধে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখিয়ে গেছেন। এর মধ্যে একটা বিষয় আছে, সন্দেহ নেই; মনে হতে পারে, সনেট তাঁর আত্মপ্রকাশের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না, এবং নিতান্ত এক আঙ্গিক-কৌতূহলের দিক থেকে তিনি এই রূপবন্ধটির চর্চা করে গেছেন, যেমন মধুসূদন প্রাথমিকভাবে করেছিলেন। তিনি যে তবু কতকগুলি সার্থক সনেট লিখে যেতে পেরেছেন, তা কবির ক্ষমতারই প্রকাশক।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সনেটে বহুবিধ ত্রুটি ও অন্যমনস্কতার পরিচয়ও যথেষ্ট। এর কারণ অবশ্য এই যে, সনেটকে তাঁর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে অনিবার্য যোগে তিনি লক্ষ্য করেন নি। ফলে মধুসূদনের অনুকারী অক্ষম চতুর্দশপদী লেখকদের শিথিলতায় আত্মসমর্পণ করতেও তাঁর বাধে নি, 'হিরণ্যকশিপুবধ' (হরিমঙ্গল) কবিতায় তিনি পঞ্চম থেকে চতুর্দশ পংক্তি পর্যন্ত অনায়াসে পর-পর পাঁচটি যুগ্মক ব্যবহার করে গেলেন।

শেক্সপীয়রীয় রীতিকে তাঁর romantic মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে উপযোগী বিবেচনা করে তিনি ঠিকই করেছিলেন, এবং এই রীতিতে চমৎকার কয়েকটি সনেটও লিখলেন, কিন্তু শেক্সপীয়ারের সনেটে পয়ার পুচ্ছটির তাৎপর্য যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার কোন প্রমাণ রাখলেন না। সেক্সপীয়ারের সনেটে পয়ার পুচ্ছটি সাধারণভাবে একটা অলঙ্করণ, কাব্যদেহের সঙ্গে অনিবার্য যোগে তা প্রতিষ্ঠিত নয়। বিস্তারে ও সংহতিতে ভাবের সম্পূর্ণতা শেক্সপীয়ারের দ্বাদশ পংক্তির মধ্যেই সাধ্য হয়েছে, পয়ার পুচ্ছটিকে যোগ করে তিনি কবিতাকে চতুর্দশ পংক্তিক করে তোলেন মাত্র, এবং সনেটের চতুর্দশ-পংক্তি নিভরতার প্রথাকে বিপর্যস্ত করেন না। মিত্রাক্ষর দ্বিপদীক নাট্যসংলাপে ব্যবহার করে অনেকসময় তিনি একটি নির্দিষ্ট ফললাভ করতে চেয়েছিলেন, যবনিকাবিহীন মঞ্চে ঐ সমিল যুগ্মকের উচ্চারণ দর্শকের কাছে দৃশ্য পরিসমাপ্তির নির্দেশক রূপেই উপস্থিত হতো, সনেটের ত্রয়োদশ চতুর্দশ পংক্তিতে তাঁর সমিল যুগ্মকের প্রয়োগ কাব্য সমাপ্তির নির্দেশকেই যেন ধ্বনিত করে তোলে। কিন্তু শেক্সপীয়ারের প্রয়োজন এবং দেবেন্দ্রনাথের প্রয়োজন এক না হতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের সনেটে পয়ার-পুচ্ছটি কোথাও অলঙ্করণ নয়, কাব্যদেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, শুধু আকৃতির যোগে নয়, ভাবের যোগেও। তাঁর সনেটে ভাবের সম্পূর্ণতা এই যুগ্মকটির ওপর নিভরশীল। এটা হতে পারে সনেটের রূপ বন্ধটি তাঁকে যতটা অধিকার দিয়েছে তিনি তার সবটাই সদ্ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভাব ও রূপের সংহতি চর্চাই যদি সনেট আঙ্গিকের কৃত্য হয়ে থাকে, তাহলে শেক্সপীয়ারের সনেটে এই দিকে যে সাধনার ইঙ্গিত আছে দেবেন্দ্রনাথ অন্তত তা লক্ষ্য করতে চান নি।

দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদনের প্রবর্তনা অনুযায়ী, চতুর্দশ মাত্রিক অক্ষরবৃত্তকেই তাঁর সনেটের ছন্দোভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ছন্দ জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতায় কখনই বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি, তথাপি সনেট পংক্তিকে কখনো কখনো অষ্টাদশ মাত্রিক দৈর্ঘ্যে স্থাপন করে তিনি সনেটে কিছুটা বৈচিত্র্য সঞ্চার

করেছিলেন। বাংলা সনেটে এ এক ধরনের নতুন পরীক্ষা সন্দেহ নেই, এবং পরবর্তী কালে অনেক কবিই এই পথে বাংলা সনেটের রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। তথাপি দেবেন্দ্রনাথই এই উদ্ভাবনার গৌরব পাবেন বলে মনে হয় না। পয়ারের মাত্রাকে ষোলতে নিয়ে যাওয়ার পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই করেছিলেন, 'কড়ি ও কোমল'-এ তাকে কুড়ি মাত্রা পর্যন্তও টেনেছেন। ফলে ষোল ও কুড়ি মাত্রার মধ্যবর্তী অষ্টাদশ মাত্রিক পয়ার-পংক্তি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনোযোগ এড়িয়ে যেতে পারে না, এবং অষ্টাদশ মাত্রিক অক্ষরবৃত্তের কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি প্রথমেই লিখলেন 'রাত্রি,' যা 'কড়ি ও কোমলে'-এর অন্তর্গত হয়েছে। ঐতিহ্যপন্থীরা এই কবিতাটিকে সনেট বলবেন কি না জানি না, কিন্তু ত্রয়োদশ পংক্তিতে সম্পূর্ণ 'রাত্রি' যে রবীন্দ্রনাথ সনেট হিসেবেই লিখেছিলেন, অন্তরঙ্গ লক্ষণে তা অভ্রান্তভাবে ধরা পড়ে। অষ্টাদশ মাত্রিক পয়ারে তিনি এর পরেই লিখলেন 'চিরদিন', যা শুধু একটি সনেট নয়, যাকে বলা যেতে পারে সনেট পারম্পর্য বা sonnet sequence, চারটি সনেটে সম্পূর্ণ একটি কবিতা। 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয় ১৮৮৬তে, অর্থাৎ তারও চোদ্দবৎসর পর প্রকাশিত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের প্রধান কাব্য গ্রন্থ 'অশোক গুচ্ছ' (১৯০০)। এই সব তথ্যগত কারণেই অষ্টাদশ মাত্রার চরণে সনেট রচনায় দেবেন্দ্রনাথকে প্রবর্তয়িতার ভূমিকায় দেখবার অভ্যাসটি স্বাভাবিক ভাবেই সমর্থিত হবে না। তিনি অষ্টাদশ মাত্রিক সনেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা ও ছন্দোমুক্তি-সাধনার অভিজ্ঞতা থেকেই এই পথে পদচারণা করেছিলেন।

গার্হস্থ্যজীবন মনস্কতাই দেবেন্দ্রনাথের কবিতার নিয়ামক শক্তি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলা গীতিকবিতায় গার্হস্থ্য জীবনমগ্নতা প্রায় একটি প্রবণতা রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায় ইত্যাদি মহিলা কবির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই ধারাটিকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন। ফলে দেবেন্দ্রনাথ এই পথের একাকী পদাতিক নন, কিন্তু এমন সর্বসময় ভাবে এই প্রবণতার কাছে তাঁর মতো খুব কম কবিই নিবেদিত ছিলেন। একটি প্রবণতাকে কাব্য প্রেরণারূপে তিনি চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন।

মা ও সন্তানের মধুর সম্পর্ককে অবলম্বন করে অথবা শিশুর নিজস্ব জগতের মাধুর্য আস্বাদনের মধ্য দিয়ে বাঙালির পরিবার ভিত্তিক গার্হস্থ্য জীবনাগ্রহকে ফুটিয়ে তোলা উনিশ শতকীয় বাঙালি গীতিকবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, দেবেন্দ্র-

নাথের কবিতা স্বভাবতই এই বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। শুধু মা, সন্তান, বা শিশু নয়; বৃদ্ধ পিতা, মাতা, ঠাকুমা, দিদিমা, কাকা, পিসিমা ইত্যাদি, কিংবা সাংসারিক প্রতিমা গৃহবধূ, ইত্যাদি বিচিত্র সম্পর্কের বুননে বাঙালির বৃহৎ সাংসারিক পরিমণ্ডল—সমস্তই কবির মনোজগৎকে অনুভূতির মাধুর্যে স্পর্শ করে। বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন সন্ধান কবিকে যেন এক শান্তশ্রী মণ্ডিত জীবনকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। 'শেফালীগুচ্ছ'র 'অদ্ভুত পাগল' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসতে পারে। মোট চারটি পরম্পরায় বিন্যস্ত এই কবিতাটির প্রথম ভাগে শিশু, দ্বিতীয় ভাগে স্ত্রী, তৃতীয় ভাগে বুড়োদিদি ও চতুর্থ ভাগে বৃদ্ধ। গৃহ প্রত্যাগত (?) কবিকে অবলম্বন করে একটি গার্হস্থ্য সংসারে যে বাঁধভাঙা আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কবিতাটিতে তারই মনোজ্ঞ চিত্র আছে। স্নেহ ভালোবাসায় বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের যে মগ্নতা, এক অনুভূতিময় ঘনিষ্ঠতায় কবি এখানে তা লক্ষ্য করেছেন। অনুভূতি যখন তীব্র হয় তখন তার প্রকাশ দু-রকমের হতে পারে, এক, তা হতে পারে সংবৃত, প্রকাশবিমুখ, গাঢ়, দুই, তা হতে পারে উচ্ছ্বসিত ও মুখর, প্রকাশমুখী অতিরেকে পরিপ্লাবিত। কূলপ্লাবী অনুভূতির এই যে প্রকাশমুখরতা, surcharge of emotion-এর এই যে expressiveness, বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনে কবি সেই সৌন্দর্যই দেখেছেন এবং অভিভূত হয়েছেন।

এই 'দর্শন' ও 'অভিভূতি' শব্দ দুটি দেবেন্দ্রনাথের কবিতার অনুসরণে খুব জরুরি বলে মনে হয়। অভিভূতি তাঁকে দৃশ্য মুখী করেছে, না দৃশ্যই তাকে অভিভূত করেছে, এ নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির কারকতাই প্রধান বললে সম্ভবত অন্যায় হবে না। সংসার চিত্রেই তাঁর আগ্রহ, একের পর এক কবিতায় গার্হস্থ্য জীবনের দৃশ্য-ভূমিকে তিনি রচনা করে গেছেন। 'অপূর্ব নৈবেদ্য'র 'মা' কবিতায় মায়ের প্রতি সন্তানের আবেগ কতখানি আদর্শায়িত হতে পারে এবং তা কিভাবে মাতৃরূপকে একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত করে, তার পরিচয় আছে। এখানে মাতৃতীর্থকেই সর্বতীর্থসাররূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং এখানে অনুভূতি দৃশ্য চিত্র রচনার মধ্যে মুক্তি পায়নি সত্য, কিন্তু শিশু মনস্তত্ত্বের আলোকরেখায় কাব্যকে উদ্ভাসিত করে তোলার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের হাতে রচিত হবার পরও দেবেন্দ্রনাথ যখন শিশুকে তাঁর কবিতার বিষয়রূপে গ্রহণ করেন, তখন তাকে গার্হস্থ্য রূপসৌন্দর্য-সৃষ্টির উপকরণ মাত্র রূপেই ব্যবহার করেন, কতগুলি গার্হস্থ্য চিত্র রচনায় শিশু চরিত্রের উপযোগিতা তিনি নিরূপণ করে নেন। 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল'-এর 'শিশুর স্তন্যপান' কবিতাটি

এখানে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করা শিশুর স্তন্যপানের দৃশ্য অঙ্কন করা এবং এই দৃশ্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করাই এখানে কবির মূল অভিপ্রায়। চতুর্থ স্তবকটি কবিতার কেন্দ্রভূমি, বাঙালির গৃহাঙ্গনকে মা ও শিশুর পরস্পরতা যে স্বর্গীয় করে তোলে, সংসার সীমায় যে অসীম অনন্তের উদ্ভাস ঘটে, এই রোমান্টিক অনুধ্যানে তিনি এখানে শিশুর স্তন্যপান দৃশ্য অঙ্কন করেছেন, যাকে তিনি সৌন্দর্যদৃশ্য রূপেই মনে করেন। এই দৃশ্যরূপেই কবির সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত; তিনি শুধু নিজে এই দৃশ্য দেখেন না, দেবতারাও দেখেন, এবং কবি এই দৃশ্যরূপদর্শনে সবার জন্যে একটি নিরপেক্ষ আহ্বান যোজনা করেন :

তুমিও গো চুপে এসে, এখানে থাক বসে—
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে—

বোঝা যায়, শিশুরূপেই শিশুকে দেখা নয়, মাতা ও শিশুর অন্তরালহীন অনিবারণীয় পরম্পরতায় রচিত বাঙালির গৃহাঙ্গনের শান্ত সৌন্দর্যই কবি এখানে আস্বাদনযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। 'রাণীর জোড়হাত' কবিতাতেও দেখা যাবে যে শিশুর সরল স্বভাবের সত্য-সৌন্দর্যে কবির আগ্রহ যখন প্রকাশ পায়, তখনও কবিতাটি একটি গার্হস্থ্য চিত্র রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর ঠাকুমা, বাবা, কাকা, পিসি, সবাই এখানে উপস্থিত, শিশুর আচরণে সবারই প্রতিক্রিয়া রচিত হয়েছে এখানে। এক ঘরোয়া পারিবারিক জীবনে অশ্রু-আনন্দে শিশু কতখানি ঘিরে থাকে, একটি শিশু তার কেন্দ্রে কতখানি আছে— এই কবিতাটি তার পরিচয় দেয়। সব মিলিয়ে দেখলে দেবেন্দ্রনাথের শিশু-বিষয়ক কবিতাই গার্হস্থ্য সৌন্দর্যরস-সৃষ্টিতে শিশুকে উপাদান-স্বরূপে ব্যবহারে তার আগ্রহই ধরা পড়ে এবং বোঝা যায় যে পৃথিবীতে স্বর্গীয় সম্ভাবনার আধার রূপে লক্ষ্য করে শিশুর তাৎপর্য প্রতিষ্ঠায় তিনি মনস্ক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় শিশুর জগৎকে অসীম রহস্য ও মাধুর্যের অনুভূতিরেখায় যেভাবে অন্তরঙ্গ ও অনিবার্য করে তুলেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' তার বহু পরবর্তী প্রকাশ হলেও তাতে তিনি রবীন্দ্রপথে পদচারণার আগ্রহ দেখান নি, পক্ষান্তরে উনিশ শতকীয় শিশু বিষয়ক কবিতার ধারাকেই যেন তিনি বহমান রেখেছিলেন। এই ধারাতে শিশু কাব্যের প্রসঙ্গ মাত্র রূপে গৃহীত, গার্হস্থ্য চিত্র রচনায় বা স্বর্গ মর্তের যোগরচনাকারী শক্তি রূপে উপস্থিতিতেই এখানে শিশুর সংস্থান নিরূপিত। তথাপি তাঁর শিশু-বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণার সঙ্গে এখানে পরিচিত হওয়াও বোধহয় একই সঙ্গে প্রয়োজন। তিনি বলছেন : 'আমি শিশু-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন

ভাবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একটা আদর্শ শিশু জীবন যাহার বিকাশ, ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক, ইহাই আমার শিশু কবিতা-গুলির বিষয়।' কবি এখানে একটা আদর্শ শিশু জীবন বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা যে-কোন কারণেই হোক, খুব স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। এর আগে তিনি তাঁর ideal womanhood সন্ধানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি যে সকল মহিলা, কি বালিকার স্তুতিবাদ করিয়াছি তাহারাই আমার কবিতার মুখ্য বিষয় মনে করা ভুল। আমি তাঁহাদের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দিক হইতে একটা ideal womanhood—নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।' এই কথাগুলির মধ্যে নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ সম্পর্কে, আমাদের কোন ধারনা হয় না, কিন্তু পরেই যখন তিনি বলেন; 'নারী জাতিকে আমি জগন্মাতার অংশরূপিনী ভগবানের সৌন্দর্য বিকাশ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না'—তখন বুঝতে অসুবিধা হয়না যে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বস্বরূপে তাঁর 'পূর্ণ আদর্শ' এর পরিকল্পনা সমর্পিত। এই সব কথা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'অপূর্ব নৈবেদ্য' সম্পর্কে বলেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু 'অশোকগুচ্ছ'র 'নারীমঙ্গল' বা 'লক্ষ্মী পূজা' কবিতায় তিনি যে নারীর আদর্শায়ন সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর এই আদর্শভাবনা যদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব স্বরূপে লক্ষ্য করতে হয়, কাব্য পাঠকের নৈরাশ্য তার চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হতে পারে না। তা হলে নারী যে 'রাজ-রাজেশ্বরী' তা সে জগন্মাতার অংশ স্বরূপিণী বলেই ? নারী 'কবি-বিধাতার শ্রেষ্ঠকাব্য' এই জন্যেই যে সে জগন্মাতার উচ্চারণ ? তা হলে নারী কবির নির্মাণ নয় ? এর চেয়ে অসহায় অবস্থা কোন কবির পক্ষে বোধহয় অকল্পনীয়। প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্য কবিই সৃষ্টি করেন। কবি নারীকেও সৃষ্টি করেন, প্রকৃতিকেও সৃষ্টি করেন, শিশুকেও সৃষ্টি করেন। প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিই বিষয়কে সুন্দর করে তোলে। এই প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত হয়েই তিনি প্রিয়ামুখের যোগ্য উপমান একের পর এক খুঁজে বেড়ান 'দুটি কথা' সনেটে প্রিয়ামুখের সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা সন্ধান করেন। অথবা 'ভুল' কবিতায় প্রিয়া অঙ্গের আটপৌরে শাড়ীকে যখন তাঁর মনে হয় বারানসী চেলী তব শ্রীঅঙ্গে ঝলকে, তখন 'একি নয়নের ভুল!' বললে সবটা বলা হয় না, তিনি অভ্রান্ত ভাবেই ভুল করেন, কিন্তু এ ভুলটাই সৃষ্টি এখানে সৌন্দর্য সৃষ্টি-হয়ে ওঠে এই অর্থে যে তা বিষয়কে বিষয়মাত্রা থেকে মুক্তি দেয়। 'বর্ষা 'শ্যামাঙ্গী বর্ষা সুন্দরী' নাম ধারণ করে কিভাবে কবির রচনা হয়ে যায়, একটি প্রাকৃতিক পরিচয়মাত্রাকে অতিক্রম করে যায়, দেবেন্দ্রনাথ তার উদাহরণ তো

নিজেই রেখে গেছেন। এই ভাবে শিশুও নির্মিত হয় ; একটি ভূষণহীন শিশু নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অকৃত্রিমতায় যে কবির দৃষ্টিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, 'নাগা সন্ন্যাসী' কবিতাটি তারই দৃষ্টান্ত। কাজেই যে কোনও ক্ষেত্রে কবির একটা নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক অভিপ্রায় থাকতে পারে, কিন্তু তিনি প্রাথমিকভাবে ও অভ্রান্তভাবে সৃষ্টিই করেন, শিল্পের বিবেচনায় যাকে বলা হয়ে থাকে সৌন্দর্যসৃষ্টি। যেখানে সৃষ্টিশীলতার বেগ কবির নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের কাছে পরাভূত হয়, সেখানে শিল্প হিসেবে তা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। অবশ্য তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার আগ্রহও শিল্প-তাৎপর্যে গৌরবী হয়ে উঠতে পারে, সাহিত্যের ইতিহাসে তার উদাহরণ অনেক। কিন্তু সেখানে তত্ত্ব জীবনযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফসলের পরিণামে ফুলের উত্তরণের ব্যাপারটি একটি তাত্ত্বিক সত্যরূপে ভারতবর্ষীয় কবিদের অনেক সময়েই উজ্জীবিত করেছে ; চিত্রাঙ্গদায় এই তাত্ত্বিক অভিপ্রায়টিকে মানুষের জীবানুভূতির সাধনায় নিবেদিত করে লক্ষ্য করে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, অনুভূতিময় জীবনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন তিনি, এবং এই জীবন সৌন্দর্যের স্পর্শেই তত্ত্বসৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, তাঁর রচনায়। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব অভিপ্রায় যদি প্রধান হয়ে ওঠে, তখন শিল্পগত যথার্থ অর্জনের জন্যই তাকে খুঁজে নিতে হয় প্রতীক, যা জীবনের অন্তর্গত, এবং সেই অর্থে জীবন্ত।

এই রকম একটা বিবেচনার ক্ষেত্রে এসে দেবেন্দ্রনাথ হোঁচট খান, তিনি আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা বা তত্ত্বের কথা বলেন, কিন্তু তাঁর শিল্প কৃতার্থতার ভূমিটি খুঁজে নিতে চেষ্টা করেন না। তাঁর মধ্যে বিস্ময়কর ভাবে অনুপস্থিত এই প্রতীক-জিজ্ঞাসা। শেলী যখন ফুলকে স্বর্গবাসনার প্রতীকরূপে ব্যবহার করেন, শিশুকে দেবেন্দ্রনাথ তেমনি স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে কখনো কখনো লক্ষ্য করতে চেয়েছেন, কিন্তু এটা আদর্শায়নের একটা পদ্ধতি মাত্র, এবং দেবেন্দ্রনাথ এই রকম ক্ষেত্রেও অনেক সময় যথাযথ শক্তির পরিচয় রাখতে পারেন নি। 'লক্ষ্মীপূজা' কবিতার ভাব-ব্যাকুলতা যখন 'জগতের সার সত্য'-এর তথ্য রূপে এসে থমকে দাঁড়ায়, তখন এই দীর্ঘ কবিতাটির সমস্ত আয়োজনকেই পণ্ডশ্রম বলে মনে হয় ; কবি যখন বলেন :

"তুমিই মা অন্নপূর্ণা, তুমিই ভারতী,
মূর্তিভেদে কমলার কতই মূরতি !
কোথাও চঞ্চলা নাম, কোথাও অচলা,
পত্রভেদে কতনাম ধরিস মঙ্গলা।"

তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের জন্য কি সত্যই কোন কবিতা লেখার দরকার ছিল। 'তুমিও কি স্বপন সৃজন'?—এ সংশয় ব্যাকুলতার উচ্চারণ কবিতাটিতে যে বার বার ফিরে ফিরে একটা ভাবধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি করে গেল, তা কি এই তথ্য প্রতিষ্ঠার জন্য? সন্দেহ নেই, দেবেন্দ্রনাথ অনেকগুলি ক্ষেত্রে এই রকম অসহায়তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তথাপি অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'লক্ষ্মীপূজা' কবিতায় কবির রোমান্টিক সৌন্দর্যব্যাকুলতায় উল্লেখযোগ্য কাব্য-রূপায়ণ লাভ করেছে। এর কারণ স্পষ্টতই একটা, তিনি তত্ত্বর সন্ধানের আগ্রহকে কোন কোন অংশে জীবন-যোগে স্থাপিত করতে পেরেছিলেন। জীবন-সৌন্দর্যের স্পর্শে তাঁর তত্ত্ব সন্ধানের অভিপ্রায়টি এইসব অংশে প্রসারিত:

নেহারে কৃষকবালা, হরিষ অন্তর
গোলাবাড়ি, মাঠ আর ঘর,
ভরি গেছে ফসলে ফসলে!
কনক-কুণ্ডলগুলি দোলে,
অতি মনোহর। সমীর হিল্লোলে!
সেইরূপ কনককুণ্ডলা,
স্বর্ণ ক ন্তি তেমতি উজলা

অথবা, আসিয়াছ মোর গৃহে? এস মা কমলা!
লইয়া বরণডালা,
যতেক সধবা বালা,
কোলে করি, বধূরে নামায়!
কৌতুকে ঘোমটা হতে,
মূর্চ্ছিয়া মৃদু হাসি,
নববধূ চারিধারে চায়!
তেমতি বধূর রূপ ধরি,
আসিয়াছ? এস মা কমলা!
তেমতি গো উৎসব লহরী,
চারিধারে বরিষণ করি,
আসিয়াছ? এস দেববালা!

শুধু কাব্যালঙ্কারের দিক থেকে কবির আত্মপ্রকাশ এখানে লক্ষণীয় নয়; জীবন-সৌন্দর্যের তিল তিল সঞ্চয়ে কল্যাণময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতিমাটি তিনি কিভাবে রচনা করে গেলেন, তার অনুক্রমটিই পক্ষান্তরে এখানে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সৌন্দর্যলক্ষ্মী এখানে জীবনেরই নির্মাণ, এবং এই দিক থেকে তাঁর একটি প্রতীকী উন্মীলনই এই কবিতায় অংশত ধরা পড়ে।

তথাপি 'লক্ষ্মীপূজা' বিশিষ্ট কবিতা হয়ে উঠতে পারে নি কবির তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের আত্যন্তিক বশবর্তিতায়। তাঁর 'নারী মঙ্গল' কবিতায় এই তত্ত্বভাবনা প্রতিষ্ঠায় কবির আগ্রহ এই রকম প্রবল নয়; কিন্তু নারীকে, 'লক্ষ্মীপূজা' কবিতায় তিনি যেমন অনেকখানি পেরেছিলেন, তেমনি করে জীবনের অন্তর্গত সৌন্দর্যের নির্মাণ করে তুলতে পারেন নি। এখানে 'লক্ষ্মীপূজা'র গৃহবধূর গৃহে আসবার মুহূর্ত্তটি নেই, কিন্তু গৃহবধূ আছে। এই গৃহবধূর পরিচয় কবি এইভাবে দিচ্ছেন :

তুমি যবে পোহাতে শর্ব্বরী,
পতিপাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমনী!)
যাও অর্দ্ধযামিনীতে—আনন্দ লহরী
জাগায়ে প্রমোদ কক্ষে।...
... ...
কি উৎসব!

এবং নিশান্তে করিয়া স্নান, পরি শুভ্রশাটি,
এলাইয়া তরঙ্গিল আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি
সাজাও পুষ্পের মালা,

এবং পশিয়া রন্ধন-গৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
সুস্বাদু! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে!

লক্ষ্য করা যায় যে একধরনের বর্ণনামূলক পদ্ধতি কবি এখানে গ্রহণ করেছেন, যা নিতান্তই যথাযথতার প্রকাশক, যাকে এমন কি প্রাথমিক চিত্ররূপেও কবি সমর্পণ করতে চান নি। উপযুক্ত কাব্যালঙ্কারের প্রয়োগ কবিতার সংবেদনাকে কিভাবে ও কতখানি স্পর্শ করে, 'লক্ষ্মীপূজা' ও 'নারীমঙ্গল'-এর উচ্চারণপদ্ধতির বিভিন্নতাই তা আমাদের দেখিয়ে দেয়। অবশ্য কল্পনার দীপ্তিই উপযুক্ত কাব্যালঙ্কার খুঁজে নেয়; 'লক্ষ্মীপূজা'তে কল্পনার সে উৎসার ছিল, 'নারীমঙ্গলে' তার অভাব; এখানে কল্পনার কার্যকারিতা যতটা আছে, তাও আভ্যাসিক ও প্রথানুগত মাত্র। এখানে পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন একটা তার্কিক পদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতি যুক্তিমার্গীয় রচনার পক্ষেই উপযুক্ত হওয়া সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে, 'নারীমঙ্গল' কবিতায় বঙ্গীয় গৃহ বধূর আদর্শায়নই সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি বঙ্গ বধূর আদর্শ-রূপ রচনা করতে চান নি, বঙ্গ-বধূকে আদর্শের গহনা পরিয়ে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলেছেন। 'হয়ে ওঠা' ও 'করে

তোলা'-র মধ্যে যা পার্থক্য, এখানেও সেই ব্যবধানটি চোখে পড়ে। কবির আদর্শের আরোপ-বাসনার কাছে বঙ্গ-নারী এখানে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে, তার নিজস্ব ও স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের সমস্ত সম্ভাবনাই এখানে রুদ্ধ। কবি একে একে বলেছিলেন যে বঙ্গ-বধূ সৌন্দর্যস্বরূপিণী, বঙ্গ-বধূ কবির প্রেরণা দায়িনী অর্থাৎ কাব্যলক্ষ্মী, বঙ্গ-বধূ শিক্ষাদাত্রী, এবং সবমিলে রাজরাজেশ্বরী, বাঙালি গৃহবধূর কাব্যলক্ষ্মীতে রূপান্তরকরণের কাহিনীই 'নারী মঙ্গল' উত্তীর্ণ হবার অভিজ্ঞতা নয়।

এবং গৃহবধূর মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ নারীর সম্পূর্ণতা খুঁজেছিলেন। বিহারীলাল বা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদাব উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার এই প্রবণতাকে বিশিষ্ট করে তোলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাতে সমর্পিত হয়েছিলেন মাত্র। নারীর ব্যক্তি-মুক্তির চেতনায় আত্মপ্রকাশের দিনগুলির অতি সমান্তরাল 'বঙ্গসুন্দরী' বা 'মহিলা-কাব্য'র রচনাকাল. মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার বেগ থেকে, তখন পর্যন্ত বিহারীলাল বা সুরেন্দ্রনাথের মুক্ত থাকা হয়তো ইতিহাসের দিক থেকে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার কালেই নূতন চৈতন্যে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা সাহিত্যে ঘটে গেছে। তথাপি তিনি নারীত্ব অনুসন্ধানের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা স্পৃষ্ট হতে চান নি, এই তথ্যটি এখানে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের শেষার্ধে সাহিত্যে নূতন জীবনসাধনার বেগ সঞ্চারিত হয়, দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় তার প্রতি একরকম উদাসীনতাই পক্ষান্তরে চোখে পড়ে। শ্বশুরের পূজার ঘরে ফুলের মালা, চন্দনের বাটি সাজাতে গিয়ে বাঙালি নারীর আনন্দ ও তৃপ্তি সম্ভব, কিন্তু এই বাঙালি নারীই আবার বলতে পারে, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। এক ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশের বন্ধনকেই আনন্দ করে তোলা, আরেক ক্ষেত্রে বন্ধনকে অস্বীকার করার আনন্দময় বেদনা। দেবেন্দ্রনাথ বন্ধনের মধ্যেই নারীর আনন্দিত রূপকে আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন।

ফলে দেবেন্দ্রনাথের যেসব কবিতায় প্রেমের অনুভূতি ও ভাবনার উদ্‌যাপন, সেখানে পরিকল্পনাগত এক বন্ধনদশা আছে। যেমন সূর্পনখা লক্ষ্মণকে বলেছিল, তেমনি করে তাঁর নায়িকা বলতে পারে না :

> প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি ;
> কহ, কোন্ যুবতীর — (আহা ভাগ্যবতী
> রামাকুলে সে রমণী !) — কহ শীঘ্র করি, —
> কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
> বাঞ্ছা তব ? অনিমেষে রূপ তার ধরি ;
> (কামরূপা আমি, নাথ) সেবিব তোমারে।

অথবা তাঁর নায়িকা এখনো জানেনা যে শৈবলিনী নামে কোন বাঙালি নারী ইতিমধ্যে প্রতাপকে বলতে শিখেছে— 'আমি সুখী হইব না, তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।" কিংবা লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলতে পারে: তুমি আমার কে? তাত জানিনা। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেউ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—।' নারীর অস্তিত্বের এই পরিধি বিস্তারের ব্যাপারটি যেকোন কারণেই হোক, দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করতে চান নি। বর্ণনামূলক সাহিত্যে চরিত্র রচনার যে সুযোগ থাকে, একজন গীতিকবির তা থাকে না, গীতিকবি ভাব রচনা করেন, চরিত্র রচনা করেন না, এই রকম একটা যুক্তি এখানে দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তোলা যায় অবশ্য। কিন্তু সেটা আত্মপ্রকাশের প্রকৃতি বিষয়ক সমস্যা মাত্র। যে কোন শিল্পীই সাধারণ-ভাবে-সমাজ চৈতন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, দেবেন্দ্রনাথ যে উনিশ শতকীয় বাঙালির জীবনের জাগরণের শক্তিকে সচেতনভাবে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন নি, এই তথ্যটি অন্তত স্পষ্ট। সামগ্রিক জীবনচেতনা বিচিত্রতায় নয়, নিবিড় সংহতিতেই একজন গীতিকবির রচনায় উচ্চারিত হয়, নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতির দিক থেকে তার অভিব্যক্তি বিষয়ক মীমাংসা কবিকেই করে নিতে হয়।

আসলে দেবেন্দ্রনাথ সমাজ-শাসিত বাঙালি জীবনের অভ্যস্ত পরিপ্রেক্ষিতকে লঙ্ঘন করতে চান নি। বাঙালি জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারটি ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, সমাজ অনুশাসিত। সমাজ শাসিত বাঙালি জীবনে দাম্পত্য প্রেমই একমাত্র বৈধ। প্রিয়া বা প্রেমিক এখানে নিরপেক্ষ নয়—সমাজ সম্পর্কে নির্ধারিত, ফলে এক ধরণের পারিবদ্ধতা এখানে থাকতে বাধ্য। প্রেমের অনুভূতির বিচিত্রতা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উচ্চারণ ও আচরণ এখানে মুক্তপক্ষ ও স্বাধীন হওয়া সম্ভবপর নয়। ফলে দেবেন্দ্রনাথের প্রেম বাঙালি গাহস্থ্য জীবনের দাম্পত্য প্রেম মাত্র। তার প্রেমানুভূতি যাপনের পেছনেও তাঁর গার্হস্থ্য জীবনমুখি প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতটি বিশেষভাবে উপস্থিত।

তাঁর প্রেম বিষয়ক কবিতায় যেমন, অন্যান্য অনেক কবিতায়ও তেমনি, বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের মাধুর্যে কবির মগ্নতার পরিচয়ই প্রধান। এই গার্হস্থ্য জীবনের সৌন্দর্যে কবি বার বার মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের একটি সমাজ-ভিত্তি আছে। বৃহত্তর সমাজের আচার আচরণ, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস সবই গার্হস্থ্য দর্পণে ধরা পড়ে। যখন গার্হস্থ্য জীবন কবিকে মুগ্ধ করে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অনুশাসনাদিও পরোক্ষ ভাবে তাঁর অনুমোদন পায়, সমাজ অনুশাসনের ফলই পারিবারিক জীবনে দেখা যায়; কিন্তু এই

ফলের বিবেচনার সময় থেকে সময়ান্তরে অনুশাসনকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় এবং সময় অনুশাসনেরও পরিবর্তন ঘটায়।

আমাদের জীবনে সামাজিক অনুশাসনের প্রতিফল সব সময় সুখাবহ হয় নি; মানববোধের ওপরে প্রথানুসরণকেই আমরা অনেকগুলি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম। উনিশ শতকে এই ধরনের কিছু কিছু সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বাঙালির চিন্তাশীলতা রুখে দাঁড়িয়েছিল। বৈধব্য, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বালিকাবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে একদিকে যেমন চিন্তাশীলতার অভিযান এই সময় দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন সাহিত্যিক রচনায় বা অভিনয়ে তার বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই ধরনের কোন কোন প্রথা ও তার সামাজিক প্রতিফলকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সংশয়, দ্বিধা বা প্রশ্ন দ্বারা এই বিষয়কে ক্ষুব্ধ করে তোলা হয় নি। তাঁর কবিতায় যেমন বিধবা আছে, তেমনি বালিকা বিবাহের প্রসঙ্গ আছে,—এই সব ক্ষেত্রে প্রসঙ্গকে একধরনের মাধুর্য-প্রলেপে লক্ষ্য করবার বাসনাই বেশি। বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে যা বিতর্কিত বিষয়, তাকে তিনি তর্কাতীত সৌন্দর্যে চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। সামাজিক সমস্যা রূপে তিনি বিষয়কে দেখেন নি, বরং বাংলার সাংসারিক জীবনের বিষণ্ণ মধুর সৌন্দর্যের উপকরণ রূপেই তিনি বিষয় নির্বাচন করেছিলেন। বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের অন্তর্গত বলেই এরা তাঁর কবিতার বিষয়, বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ বলেই এই ধরনের উপকরণও কবির মুগ্ধতার বিষয়। তাঁর প্রেম ও নারী বিষয়ক কবিতাতেও একই প্রবণতার উদ্‌যাপন। দাম্পত্য পরিধির বন্ধনদশা হয়তো সেখানে আছে, কিন্তু এই বন্ধনের বোধ সেখানে অনুপস্থিত। বন্ধনের বোধ অনুপস্থিত বলেই প্রেমানুভূতির দাম্পত্য—নির্ভরশীলতা তাঁর কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক পরিপ্রেক্ষিত মাত্র, এর মধ্যে কোন অভাবাত্মকতার পরিচয় নেই। এরই ফলে তিনি পেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন প্রেমানুভূতি-যাপনে সীমার স্বভাব; গৃহবধূর নির্দিষ্টতা প্রেমের বিচিত্র আস্বাদনে ও অনির্দিষ্ট উল্লাসে উচ্চারিত হতে তাঁর পক্ষে বাধা স্বরূপ হয় নি।

৪

ভারতবর্ষীয় সংস্কারে গৃহ-বধূ একই সঙ্গে প্রেয়সী নারী ও গৃহের কল্যাণী প্রতিমা। একদিকে সে ইন্দ্রিয় সংস্কারে, অপর দিকে ইন্দ্রিয়-অতিক্রমী মঙ্গল-শক্তিতে নির্মিত একটি আইডিয়া। দেবেন্দ্রনাথ যে নারীকে দেখেছেন, তার রূপের

ও তেমনি দুই ভাগ : তার দেহরূপ ও কল্যাণ রূপ। এই দুইএর যোগেই নারীর রূপ সম্পূর্ণ। দেবেন্দ্রনাথ যখন নিজেকে 'রূপের পূজারী' বলেন, তখন তাঁর নারী রূপ-চেতনায় এই সম্পূর্ণ নারীরূপই প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পূর্ণ রূপই সুন্দর, এই সৌন্দর্যই চেতনাকে জাগ্রত করে, আবার এই সৌন্দর্যের মধ্যেই চেতনা পরিণাম খোঁজে, নির্বাপণ চায়। সৌন্দর্যই উদ্বোধক শক্তি, আবার সৌন্দর্যই পরিণামী লক্ষ্য।

বস্তুর বা বিষয়ের রূপ আছে, গুণ রূপাতীত ; কিন্তু গুণের প্রকাশ রূপাত্মক। এই দিক থেকে দেখতে গেলে নারী উভয় দিক থেকেই রূপময়ী এবং এইভাবে সম্পূর্ণরূপা। দেবেন্দ্রনাথ এই রূপময়ী নারীকেই দেখেছিলেন, তাঁর সন্ধান এই রূপেরই সন্ধান এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি রূপমগ্ন বা রূপতন্ময়। তাঁর কাছে এই রূপই সৌন্দর্য, হৃদয়ের প্রীতির স্পর্শেই তিনি রূপের এই রূপান্তর সাধিত করেছিলেন।

এবং এখানে কবির এই প্রীতির স্বরূপ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা আপেক্ষিত থেকে যায়। অনেকেই ইন্দ্রিয়াশ্রিত লক্ষণে তা দেখতে চেয়েছেন, তার মধ্যে 'চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র মদিরা' ও 'চম্পকের সৌরভ'ই অবলম্বনীয় বলে প্রায় একটা সিদ্ধান্তের সমীপবর্তী হয়েছেন। মোহিতলাল অবশ্য একে কবির কল্পনা-শক্তির বিশিষ্টতা রূপেই ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু আমরা জানি যে কল্পনা-বিশিষ্টতার পক্ষে অনুভব-বিশিষ্টতার বিরোধী হওয়া সম্ভব হয়না, অভিব্যক্তি-ধারায় এই দুই অঙ্গাঙ্গী অনুভবের বিশিষ্ট কল্পন। বিশিষ্ট অনুগত বা দুই অতি ঘনিষ্ঠ, অবিচ্ছিন্ন ও পরস্পর। তাহলে দেবেন্দ্রনাথের অনুভূতির রঙ গাঢ়, অশোকের মতো, চম্পকের তীব্র সৌরভের মতো, চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রের মতো। মোহিতলাল এই প্রসঙ্গে 'মত্ততা শব্দটির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রূপই এই মত্ততার কারক ; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে রূপের পূজারী বলেছেন। এই শব্দবন্ধে যেমন 'রূপ' আছে, তেমনি 'পূজা'ও আছে। রূপ বৈশাখী অশোকের মতো হতে পারে, কিন্তু পূজার রঙ কিছু আলাদা।' মোহিতলাল কবির লালসার মধ্যে যে পুষ্পের কোমলতা ও ধূপ-সৌরভ-এর স্নিগ্ধতা লক্ষ্য করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে রূপ ও পূজা শব্দেরই ব্যাখ্যা মাত্র। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথে রূপমত্ততা কিভাবে ও কোন বিন্দুতে এসে পূজায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, তা নিরূপণ করা শক্ত।

অনেক সময় বরং মনে হতে পারে যে রূপকে মত্ততার আবেগে না দেখে পূজার শুচিতায় লক্ষ করার মধ্যে আত্মিক সাধনার বেগ দেবেন্দ্রনাথে খুব গুরুতরভাবে উপস্থিত ছিলনা, এক ধরনের নৈতিক বুদ্ধির সহযোগিতায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই পরি-

বর্তন সম্ভব হয়েছিল। রূপ একটি সর্বময় তৃষ্ণার মতো কবিকে আচ্ছন্ন করে আছে, রূপ-পিপাসাকে তিনি সৌন্দর্য-পিপাসার সমার্থক রূপে ব্যাখ্যা করতে চান :

জীর্ণ বক্ষ, দীর্ণ প্রাণ, সৌন্দর্য-তৃষ্ণার হায়,
রূপ-পিপাসায় !

এবং এই পিপাসাকে তিনি দর্শনে মেটাতে চান, স্পর্শে জুড়োতে চান। আবার বলেন যে 'এই মোহ মদিরা'ই 'ইষ্টদেবতার মতো। বোঝা যায় যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত রূপ-মাদকতাই তাঁর তৃষ্ণাকে অন্তহীন করেছে। এই সর্বগ্রাসী পিপাসার হাত থেকে মুক্তি একমাত্র সম্ভব ইন্দ্রিয়াশ্রয়ের বন্ধন থেকে মুক্তিতে। 'গোলাপগুচ্ছ'র 'রূপ-তৃষ্ণা' কবিতার উপসংহারে অতঃপর তিনি বললেন :

সর্বনাশা ভালোবাসা, দারুণ পিপাসা,
ঘুচিল না হায় !
তুলে তারে, লয়ে ঘাটে, শ্মশানে, জাহ্নবী ঘাটে,
জ্বালিয়া প্রদীপ্ত- বহ্নি, চাহিলাম হায়,
জানিতে সে রূপকান্ত কেমন দেখায় !
সে বর বপুর মাঝে, কি দ্রব্য লুকান আছে,
যাহে তনু উদ্ভাসিত লাবণ্যচ্ছটায় !
লক্ লক্ জিহ্বা দিয়া, তনু তার পোড়াইয়া,
রাক্ষসী প্রকৃতি হাসি, কহিল আমায় ।—
'বিশুদ্ধ সৌন্দয-তত্ত্ব
বুঝিয়াছ হে উন্মত্ত ।
ঘরে যাও, আর কেন নর পিপাসায়' ।

বোঝা যায়, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য যে ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী অনুভূতি অতিক্রমী, দেবেন্দ্রনাথ একটি বুদ্ধিগত তাৎপর্যেই তাকে লক্ষ্য করতে চান। তাঁর কবিতায় রূপের রতিই প্রধান, রূপের আরতি সাধনবেগ-সম্ভূত নয় বলে অনেকসময় একটি আরোপিত নৈতিক ঔচিত্যবোধের ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। অথবা 'আরতি' শব্দের মধ্যে 'রতি'র যোগটি তিনি সবসময়েই সচেতনভাবে মনে রেখেছিলেন বলা যেতে পারে।

'গোলাপগুচ্ছ'র 'শেষ চুম্বন' কবিতাটি প্রসঙ্গত মনে আসে।' রূপতৃষ্ণাতুর কবিতায়—প্রিয়ার দেহের ভস্মীভূত হওয়ার চিত্র অঙ্কন করে কবি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, 'শেষ চুম্বন' কবিতায় প্রিয়ার মৃতদেহ থেকে চুম্বনের তীব্র মদিরা তিনি পান করতে চেয়েছেন। প্রিয়ার রূপময় দেহ যখন চিতার আগুনে পোড়ে, কবি তার মধ্যে রূপসন্ধান করেন, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী চেতনার এ-এক

ধরনের প্রকাশ, প্রিয়ার মৃতদেহ থেকে তিনি চুম্বনের জ্যোৎস্না সঞ্চয় করে নিতে চান যখন, তখন সেই একই চেতনা অধিকতর তীব্রতায় ধরা পড়ে। মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় Morbidity-র কথা হঠাৎ তুলেও সাত তাড়াতাড়ি যতই বাতিল করে দিন, এইখানে কবি-কল্পনা কোন সুস্থতার বোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেনা বরং একধরনের রুগ্ন অস্বাভাবিকতার স্পর্শে আমরা সংকুচিত হয়ে যাই। দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রিয়াশ্রয়ের আত্যন্তিকতা দেবেন্দ্রনাথে এমন একটি বেগ যা কবিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাঁর কল্পনার শক্তি ও দুর্বলতা দুইই সমাচ্ছন্নতার ফসল। তাঁর এই ইন্দ্রিয়াশ্রিত অনুভূতি খুব কম ক্ষেত্রেই চমৎকার কাব্য রচনায় চরিতার্থ হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কবির একটি বিশিষ্ট প্রবণতার উদাহরণ রূপে চিহ্নিত মাত্র। কয়েকটি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় তাঁর এই বিশিষ্ট অনুভূতি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি সহায়তা করেছে, এই মুহূর্তে 'শেফালী গুচ্ছ'র অন্তর্গত 'বৈশাখ' কবিতাটির কথা উদ্ধার করা যায়। সন্দেহ নেই, এই কবিতায় কবির অনুভূতি প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্রিয় আশ্রয়ে নির্মিত নয়, কিন্তু একটি পৌরাণিক অনুষঙ্গকে বৈশাখের ভাবমূর্তি রচনায় রূপাত্মক কল্পনায় ধারণ করে কবি তাঁর বিশিষ্ট প্রবণতারই অনুগত থেকেছেন। চৈত্র বৈশাখে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, বা বৈশাখ এসে চৈত্রকে গ্রাস করছে—এই প্রাকৃতিক ব্যাপারটিকে তিনি বর্ণনামূলক রূপাত্মকতায় ধারণ করতে চেষ্টা করেন নি, পক্ষান্তরে সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ করে একটি শরীরী রূপের বিগ্রহে বিষয়টিকে তিনি রূপায়িত করেছেন। রতি ও মদনের পুরাকল্পনাটি তাতে ইন্দ্রিয়ানুভাবের একটি যোগ স্থাপন করে গেছে। 'অশোক গুচ্ছ'র 'অশোক ফুল' কবিতাটিতেও কবি যে বর্ণবিলাসের আয়োজন করেছেন, তাতে বাসনাময় রূপসন্ধানের আগ্রহই ধরা পড়ে। এবং এই রকম কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেখানে কবি এই বিশিষ্ট অনুভূতির সহযোগিতায় বিষয়কে উদ্ভাসিত হতে দিয়েছেন এবং ব্যক্তি-অনুভূতির বিশিষ্টতা ব্যাখ্যায় তাকে ব্যবহার করেন নি, সেখানেই তিনি সাধারণভাবে সফল হয়েছেন। যখন তিনি বলেন:

মিলনের উপকূলে, সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জ্জয় বানের মুখে দেব ভাসাইয়া সুখে
দেহের বহিত্রে বাঁধা অতৃপ্ত জীবন।
(দাও দাও একটি চুম্বন / অশোক গুচ্ছ)

তখন কবির অনুভূতি যে আবেগের তীব্র অস্থিরতায় কেঁপে পড়ছে আমাদের তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু দেহের বহিত্রে বাঁধা অতৃপ্ত জীবনের উচ্চারিত লক্ষ্যেও সমস্ত প্রকাশ-

টিই একটি উক্তি মাত্র বলে মনে হয়। যে কোন উচ্চারণই উক্তিমাত্র, বিবেচকরা একথা প্রাথমিক ভাবে মনে রেখেও কাব্যোচ্চারণ পদ্ধতির অনুসন্ধান করেন এই কারণেই যে, উক্তি ও কাব্যোক্তির প্রকৃতি আলাদা। অথবা যা উক্তি মাত্র, কবিতার উপাদান রূপেই কখনো কখনো তা কবিতায় চরিতার্থ হতে পারে কিন্তু সাধারণ উক্তি, পদ্যবন্ধে উপদেশামৃতের মতোই, কবিতার পক্ষে উপযোগী হয় না। অথচ যখন তিনি লিখলেন :

কপালে কঙ্কণ হানি, মুক্ত করি চুল
বাসন্ত যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল!
স্বামী তার, 'চৈত্র মাস,

(বৈশাখ / শেফালী গুচ্ছ)

তখন রূপায়িত অনুভূতির স্পর্শে আমরা সহজেই সিঞ্চিত হই। দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার ক্ষেত্রেই এটা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা যে, যখন তিনি আত্মগত অনুভূতি যাপন করেন, তখন তিনি প্রায়ই বিশৃঙ্খল ও উক্তিপ্রধান আবেগী, কিন্তু যখন তিনি বিষয়াশ্রিত, তখন তিনি উক্তি ও অনুভূতির যোগে সাধারণভাবে আকর্ষণীয়।

দেবেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াশ্রিত কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় তাঁর ছোট মাপের কবিতায়, বিশেষ করে সেই সব কবিতায়, যেখানে লঘু কল্পনার পাখায় তিনি উধাও হতে চেয়েছেন। যেমন 'লক্ষ্ণৌর আতা'; এমনকি 'ডায়মন-কাটা-মল' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে একটি বিশেষ কারণে। তাঁর কবিতায় সাধারণভাবে দৃশ্যেন্দ্রিয়ের প্রাধান্য, রচনা ও স্পর্শেন্দ্রিয়ও জাগ্রত, গন্ধের প্রতি আসক্তিও আছে। কিন্তু সজাগ শ্রুতি-ইন্দ্রিয়ের কার্যকরতা কখনই বিশেষ প্রধান হয়ে ওঠে নি। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কয়েকটি ইন্দ্রিয় প্রায় পাশব স্তরের, এরই মধ্যে দৃশ্য ও শ্রুতির উন্নততর স্বভাব সম্পর্কে আমরা অবহিত। কবিতার এই দৃশ্যই ছবি, এই শ্রুতিই গান। দেবেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়ানুভূতি খুব কম ক্ষেত্রেই শ্রুতি-ইন্দ্রিয়েরই ওপর নির্ভরশীল, এই দিক থেকে 'ডায়মন কাটা-মল' সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশোক ফুলের দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণ বিলাসে কবি উদ্দীপিত হয়েছিলেন, মলের শব্দ থেকে চিনে নিতে পেরেছিলেন আপন বধূকে। "যে কবি অশোক মঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণ-ঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য-কথাটি চুরি করিয়া লইতে পারেন, সেই কবির প্রতি একদা রবীন্দ্রনাথের স্তুতি বর্ষিত হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই তিনি 'অশোক ফুল' বা 'ডায়মন কাটা মল'

পরেছিলেন। কিন্তু সেটা ১৯০১ সাল, এক বছর আগে 'অশোক গুচ্ছ' বেরিয়েছে, এবং দেবেন্দ্রনাথের কবি-জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে তখনো প্রায় একযুগ বাকি।

রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ছবি ও গানের সামঞ্জস্য খুঁজে ছিলেন, যাকে বলা যায় দৃশ্য ও শ্রুতির সামঞ্জস্য। এমন কি দৃশ্যও কেমন ভাবে গান হয়ে যায়, গীতি-কবিতার সাধনায় কবিরা তার পরীক্ষায় বার বার নিজেদের নিয়োজিত করেন। দেবেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াশ্রিত অনুভূতির প্রকাশে শ্রুতি-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কৃপণ হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিরাপদ সান্নিধ্যে থেকেও কেন তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল কবিতাকে গান করে তোলা, তা দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে পরবর্তী সমীক্ষার একটি বিষয় হতে পারে।

—০—

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

যতীন্দ্রমোহনের 'লেখা' বেরিয়েছিল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ কবিরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশের কাল বিংশ শতাব্দী। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ বাইশ বৎসরকাল তিনি দেখেছিলেন, যে সময়টাকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাপর্ব বলা যায়। 'মানসী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯০-তে, বিভিন্ন সমালোচক 'মানসী'র প্রকাশকে বিশেষ তাৎপর্যে লক্ষ্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথও গ্রন্থখানিকে 'বিশেষ রকমে স্বকীয়' বলেই উল্লেখ করেন। এইসব পর্যবেক্ষণে স্বভাবতই সমালোচকদের বিচিত্র অভিপ্রায় উপস্থিত, এবং 'মানসী'তে 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল', — রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাই সম্ভবত সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে। ১৮৯০ সালে যতীন্দ্রমোহন বালক মাত্র, এবং তাঁর কিশোর বয়স পেরিয়ে আসবার আগে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র আবির্ভাবে বাংলা কবিতার আসর খুব জমজমাট। বিশ শতকের গোড়াতেই পাওয়া গেল 'কল্পনা', এবং প্রায় সমান্তরালে ক্ষিপ্র তৎপরতায় এলো প্রতি-নিমেষের কাহিনী 'ক্ষণিকা'। যতীন্দ্রমোহন এই সময় কলকাতাবাসী।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সম্মোহ তখনো গত হয় নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছেন, এই ঐতিহাসিক বিচারে প্রথম যৌবনেও যতীন্দ্রমোহন সৌভাগ্যবশতঃ কোন ভুল করেন নি। প্রথম যৌবনের সগুলব্ধ প্রাণশক্তি যখন অভিমুখিতার চেয়ে পল্লবতাকে বেশি সমর্থন করে, যতীন্দ্রমোহন তখনও যে রবীন্দ্রনাথেই সদগতি ভাবতে পেরেছিলেন, তা তাঁর কবি মতিত্বেরই পরোক্ষ সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য তাঁর সমকালে জীবিত সাহিত্যাচার্যদের সান্নিধ্য লাভ করবার অত্যুৎসাহ থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না, তিনি অকপটেই জানিয়ে গেছেন: 'সাহিত্যে যাঁরা বড়, অসীম শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করিবার বাসনা সেদিন কি প্রবলই না ছিল।' তিনি সেই কালকে 'শ্রদ্ধার যুগ' বলে উল্লেখ করেছিলেন, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করার এক সহজ সরল অনুশাসন তখনকার দিনে অলিখিতভাবে প্রচলিত ছিল বলেই সম্ভবত তিনি এই ধরণের যুগ পরিচয় নিবেদন করতে পেরেছিলেন। এই শ্রদ্ধার বশেই তিনি মেট্রোপলিটান স্কুলের ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখবার জন্যে, অথবা চৈতন্য লাইব্রেরীর

উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ করবেন বলে। বঙ্কিমচন্দ্র এক বৌ-ভাতের অনুষ্ঠানে নিজ হাতে তাঁকে মিষ্টান্ন পরিবেশন করেছিলেন, এই স্মৃতিতে পরবর্তীকালে তিনি যথেষ্ট গৌরব ও রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন; রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করতে পারবেন বলে এক সঙ্গীত সমাজের বৈতনিক সভ্য হয়েছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সি. আর. উইলসনের 'হায়ার ট্রেনিং ফর ইয়ং মেন এ্যাণ্ড উইমেন' হলে অনুষ্ঠিত এক পার্টিতে উপস্থিত থেকে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে তিনি পরিচয় করে নিয়েছিলেন, অন্ধকবি হেমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হতে সুদূর খিদিরপুর পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন। এইসব পরিচয়গুলিকে যতীন্দ্রমোহন 'সৌভাগ্য' বলে মনে করতেন; কিন্তু এই 'পরিচয়-সৌভাগ্য' লাভের জন্য তাঁর এই উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ যে 'অকালপক্ব কৈশোরের লুব্ধতা' মাত্র, সে-সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

এই 'অকালপক্ব কৈশোরের লুব্ধতা' যে শ্রদ্ধাবোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল, যতীন্দ্রমোহন তা মোটামুটি বিশ্বাস করতেন। এই শ্রদ্ধার পরিচয় তিনি উদ্ঘাটন করেছেন এইভাবে: 'সেদিনকার সে শ্রদ্ধা কেবল গুণমুগ্ধতা নহে; এমন একটি সম্ভ্রমপূর্ণ ভক্তিবিহ্বলতার ভাব, যাহা শ্রদ্ধেয়কে মনুষ্যলোকের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরে।' এই মনোভাবের সারিক ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরকে দেখতে আমাদের সাধারণ মানুষের মতো বলে এককালে তিনি আহত হয়েছিলেন, অথবা রবীন্দ্রকণ্ঠের জয়ধ্বনিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মিত মুখে তিনি তরুণ ধনঞ্জয়ের কৃতিত্বে ভীষ্মের সুখের স্মিতহাস্য লক্ষ্য করেছিলেন। এ সবই শ্রদ্ধা দ্বারা পুষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মধ্যে ভক্তি বিহ্বলতার স্থান অপ্রধান নয়। মনে হয় সর্বত্রই যতীন্দ্রমোহনের শ্রদ্ধা পূজায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফলে যতীন্দ্রমোহনের রবীন্দ্রানুরাগ রবীন্দ্রভক্তিরই নামান্তর মাত্র, এবং ভক্তরূপেই তিনি রবীন্দ্র সান্নিধ্য ও তাঁর সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতার প্রসাদ কুড়িয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সেকালের এক সাধারণ লক্ষণ; এরই মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের মতো সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র রবীন্দ্রানুরাগ খুবই প্রকাশ্য হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় করে দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রবীন্দ্র-বিরোধিতাব বিরুদ্ধে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে পেয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সম্পাদনা করেছেন সেই 'মানসী' পত্রিকা যার সাহিত্য-বিশ্বাস ব্যোমকেশ মুস্তাফীর কথায়; 'বর্তমান-সাহিত্যযুগবিধাতা রবীন্দ্রনাথ।' তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্র-বিরোধিতামূলক

সমালোচনা 'কাব্যে নীতি'র বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন, যার ফলে, কালিদাস রায় জানাচ্ছেন : 'যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বান্ধবতার বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়।' তিনি, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই, তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে, সত্যেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে টাউন হলে রবীন্দ্র সম্বর্ধনার আয়োজন করেন, এবং সেই সভায় সত্যেন্দ্রনাথের একটি কবিতা ও তাঁর নিজের একটি কবিতা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১৩২৬ এ একটি রবীন্দ্রানুরাগী সভা স্থাপিত হয়, যার নাম সত্যেন্দ্রনাথ রেখেছিলেন 'রবীন্দ্র মণ্ডলী'। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন : 'সত্যেন্দ্র এ সভার প্রথম উদ্বোধন করেন।'

বোঝা যায়, উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার প্রকৃতি ও প্রকরণ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে যে সমস্যার মুখোমুখি হয়, তাই কালক্রমে রবীন্দ্র-বিরোধিতার রূপ নেয়, এবং এই বিরোধিতার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রানুসরণ ও রবীন্দ্রানুগত্য একটি শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যতীন্দ্রমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ এই শক্তি কেন্দ্রের আবাসিক ছিলেন।

২

শান্তিনিকেতনের দীনেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে কতখানি সমর্পিত ছিলেন এবং যেকোনও কারণেই হোক, অক্ষয়কুমার দত্তের এই পৌত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ অকৃপণ ছিল। তাঁর তরল কল্পনার যথেচ্ছাচার ও কাব্যহীনতার প্রকাশ্য পরিচয় সত্ত্বেও তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই স্নেহাকর্ষণ শুধুই ব্যক্তি ঘনিষ্ঠতার আবেগের দান বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, সেরা রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই সম্ভবত একমাত্র কবি যিনি বাংলা কাব্য সাধনায় আত্ম-চিহ্ন স্বাক্ষরিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছন্দো-জিজ্ঞাসার সীমাবন্ধন থাকতে পারে, কিন্তু তাকে নিজের কবিতার একটি চরিত্ররূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তার এই শক্তিই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রতি মনোযোগী করে থাকতে পারে, এবং এই তথ্য তো আমাদের পরিচিত যে 'লিপিকা'র কবিতা রচনাকালে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে গদ্যছন্দ চচায় অনুরোধ করবার পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে উভয়ের বন্ধন শুধু ব্যক্তি-বন্ধন ছিল না, কাব্য মনস্কতার বন্ধনেই উভয়ে ঘনিষ্ঠতর হয়েছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন পক্ষান্তরে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর দিন রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলেন যে তাঁর গানের আসরে তাঁর কন্যাকে তিনি সুযোগ মত ডেকে নেবেন, আর নিজের কবিত্বের যোগ্যতার পরিচয়পত্র বার বার তাঁর কাছ থেকে পেতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহনকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার যে সামান্য অংশের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা থেকে কয়েকটি খণ্ডাংশ এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায় —

১। তোমার নাগকেশর পড়িয়া দেখিলাম। দেখিলাম তোমার লেখনী তোমার কবিত্বকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতন এখনো সমান বেগে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। (১৭ কার্তিক, ১৩২৪)

২। তোমার নীহারিকা পড়ে খুসি হয়েছি। কিন্তু অভিমত দেবার পালা আমি সাঙ্গ করতে চাই। তোমার কাব্যের প্রতি কোন সমালোচনা অবজ্ঞা প্রকাশ করেচে কিনা আমি জানিনে — ছাপার কাগজের মুখোষ পরে যারা বচংবক সাজে, মুখোষ খুলিয়ে তাদের কণ্ঠধ্বনি শুনিলেই তখনী বোঝা যায় তারা কোন্‌জাতের। সৃষ্টি করবার অধিকার তোমার লেখনীতে আছে। (১৭ চৈত্র, ১৩৩৪)

৩। কবিত্বের আসরে যাদের নতুন আগমন তাদেরি তো পরিচয় দরকার। তুমি চেনা বামুন, তোমাকে ফিরে ফিরে পৈতা পরাবার মানে নেই। ··· যাই হোক তোমার রচনা স্রোতে ভেসে চলেছে, আমাকে দিয়ে লগি ঠেলাবার প্রস্তাব কোরো না। (১৯ শ্রাবণ, ১৩৪৩)

দেখা যাচ্ছে, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে কবির কাব্যসংকলন-গ্রন্থ যখন প্রাকাশিত হয়ে গেছে, তখনও যতীন্দ্রমোহন তাঁহার কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষায় থাকেন। তার প্রথম কবিতার বই 'লেখা'র (১৯ ০) কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে নেওয়া প্রচলিত ধারায় তরুণ কবির পক্ষে অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না, বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভবত তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু কবি-জীবনের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হয়ে স্বীকৃতির জন্য রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে থাকা যেকোন দিক থেকেই নৈরাশ্যজনক বলে মনে হতে পারে। এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা অনুসরণ করলেও একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কার্পণ্য না হলেও তার মধ্যে কোথায় যেন একটা দূরত্ব আভাসিত। প্রকৃতপক্ষে, এই 'দূরত্ব' শব্দটিই বোধহয় এখানে একমাত্র ব্যবহারযোগ্য শব্দ, এমন

কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ পদার্পণ করলেও, কবি-রূপে উভয়ের যে দূরত্ব অপসারিত হতে পারেনি। যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ কবিরা যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রানুসারী বলে কাব্যসংসারে চিহ্নিত হয়ে গেছেন, সাধারণভাবে উনিশ শতকীয় বাংলা গীতি কবিতা ঐতিহ্যেরই উত্তরসাধক, তবে রবীন্দ্র-জ্যোৎস্নায় তার প্রসাধনটিকে সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁদের কবিতার রবীন্দ্র সান্নিধ্য ব্যাপারটির মধ্যে গুরুতর ব্যবধানের একটি অংশ আছে। অন্যদিক থেকেও এই দূরত্বটি যতীন্দ্রমোহনের ক্ষেত্রে যে তাঁর নিজেরই সৃষ্ট, তা-ও কখনো কখনো মনে হতে পারে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে এক কবি-বিগ্রহ রূপে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেও সেই অভ্যাসের হাত থেকে তিনি উদ্ধার পান নি। রবীন্দ্রনাথের ইমেজ তিনি এইভাবে গড়তে চেয়েছিলেন: 'কবির প্রেরণা তুমি চিত্তমাঝে, ভক্তের বিনতি।' এই আলোকে যতীন্দ্রমোহনের রবীন্দ্রধ্যানের স্বরূপটি অনায়াসেই প্রকাশিত হয়ে যায়। তাঁর স্মৃতি-তথ্যেও এই কথা খুব প্রকাশ্য যে তিনি ব্যক্তিগত রূপে একটি মহৎ ব্যক্তিত্বকেই আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন, এই ব্যক্তি-ঘনিষ্ঠতার মধ্যে ভক্তিযোগ এত প্রবল ছিল যে কবি-রূপে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যকে তিনি অধিকার করে নিতে পারেন নি। এ তাঁর একধরণের পরাভব বটে, কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে অসাধ্য ছিল এই বিধি অতিক্রম করা। ফলে সান্নিধ্যও যে দূরত্বের সমার্থক হতে পারে, যতীন্দ্র-রবীন্দ্র সম্পর্ক তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

এবং রবীন্দ্রনাথ যে যতীন্দ্রমোহনের চেতনায় প্রায় সর্বময় রূপে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর ব্যক্তি-তথ্য ও কাব্য-তথ্য থেকে তা সহজেই ধরা পড়ে। 'রবীন্দ্রানুসারী' শব্দবন্ধের আড়ালে তাঁর কবি-পরিচয়টি সম্ভবত এই কারণেই নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সচরাচর 'অনুসরণ' ও অনুকরণ শব্দ দুটি অর্থবৈষম্যের জন্যই আমরা সাহিত্য বিচারে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' ঠিক কোন অংশে পৃথক হয়ে যায়, সাহিত্যবিচারে তার কোন নির্দিষ্ট বা বিশ্বাসযোগ্য সীমা নির্ধারিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এই দুটি শব্দ সাহিত্যে এত ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর যে যতীন্দ্রমোহন কোন অংশে রবীন্দ্র-অনুকারী ও কোন অংশে রবীন্দ্র-অনুসারী, তা স্পষ্ট তথ্যে-ও মানচিত্রে তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। অন্যথায় একে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবজাত ব্যাপার বলে সম্ভবত লক্ষ্য করা সম্ভব। মধুসূদন যখন 'মেঘনাদবধ' রচনা করেন অথবা রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ,' তখন তাঁরা যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করেন বটে, কিন্তু তা সঙ্গে সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বকেও প্রতিষ্ঠিত করে। কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে গৃহীত বিষয় ও ভাবধারার যে রূপান্তর

ঘটে, এখানে তা-ই প্রধানভাবে লক্ষনীয় হয়ে ওঠে, এবং তা কবি-ব্যক্তিত্বকে সাধারণ ভাবে আড়াল করে রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কালিদাসের প্রভাব বা শৈলীর প্রভাব—এই রকম আলোচনায় যখন কোন কোন সমালোচক আগ্রহ দেখান, তখন তাঁরা খুব ভুল করেন বলে মনে হয় না, এই ধরনের বিবেচনা রবীন্দ্রনাথের গৌরবের পক্ষে হানিকর না হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের এক অতি আকর্ষনীয় উপাদান রূপেই চরিতার্থ হয়। অপরের ভাব ও বিষয়কে অবলম্বন করে কবি যে আত্মনির্মাণ করেন, সাধারণ ভাবে সেই নির্মিত অংশের বিচারই নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য-বিচার বা কবি-ব্যক্তিত্বের বিচার। যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেও কোথায় যতীন্দ্রমোহন, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতাধন্য হয়েও কোথায় দূরত্বের আবাসিক, এই ধরনের অনুসন্ধানে, সন্দেহ নেই আমরা বিস্ময়করভাবে কুণ্ঠিত, কেবলমাত্র 'রবীন্দ্রানুসারী' শব্দবন্ধের আড়ালে যতীন্দ্রমোহন প্রমুখদের কবি-পরিচয় আমরা অবসিত হতে দিয়েছি।

এ-সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে এই শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের নিবেদিত ছিলেন কিছু কিছু কবি, এবং কিছু কিছু কাব্য-বিবেচক আমাদের জানিয়েছেন যে এই অনিবার্য আচরণ তাঁদের জন্য কোন ধন্য পরিণাম রচনা করিতে পারে নি। 'রবীন্দ্রানুসারী'শব্দটি ব্যবহার করে তাঁদের নিয়তির পরিচয় নির্দিষ্ট করে তোলা হলো, যা একধরনের স্বীকৃতি বটে; কিন্তু এই শব্দটির মারফতই আবার বাতিল করে দেওয়া হলো তাঁদের যোগ্যতা। এই সব কবিরা অনেকেই জীবিতকালের মধ্যেই এই দণ্ডাদেশ শুনেছেন ও দণ্ড ভোগও করেছেন। পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁরা এই দণ্ডের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু কেউ কেউ, যেমন কালিদাস রায়, যে নিজের কাছেই অতঃপর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চেয়েছেন, সেই তথ্য উপস্থিত আছে। সমালোচনা-পীড়িত যতীন্দ্রমোহনও যে রবীন্দ্রনাথের কাছে সমর্থন খুঁজেছেন, ইতিপূর্বে উদ্ধৃত পত্রাংশ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু কবিরূপে নিজের ভূমিকাকে তিনি কখনো বিশ্লেষণ করে দেখেন নি। শক্তিতে ও দুর্বলতায় প্রত্যেক কবিই সাধারাণভাবে নিজস্ব একটা পরিধি রচনা করেন, সেই পরিধিবদ্ধ অংশই তাঁর নিজস্ব ভূখণ্ড। কোন কবি যখন আত্ম-পক্ষ সমর্থন করেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি আপনক্ষেত্র ও পরিধিকেই পক্ষান্তরে নির্দেশিত করেন, এবং বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কবি বিবেচিত হতে চান তাঁর সেই নির্দিষ্ট পরিধির পরিপ্রেক্ষিতে।

কিন্তু যতীন্দ্রমোহন এই রকম কোন বিবেচনা আমাদের উপহার দেন নি।

পক্ষান্তরে, তিনি ছিলেন অভিমানী। তাঁর অভিমান ছিল সেই প্রজন্মের ওপর, যারা কবি-রূপে তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদায় দেখতে চায় নি। কালিদাস রায় সুন্দর ভাবে তাঁর এই মনস্তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৪৭-এর সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণেও এই অভিমানের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যে সচেতনতায় আপনার ক্ষেত্র ও পরিধি সম্পর্কে নিজেই সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠতে পারা যায়, তাঁর মধ্যে অসহায় ভাবে তা অনুপস্থিত ছিল। হতে পারে, তাঁর এই আত্ম সচেতনতার অভাবই যতীন্দ্রমোহনকে যতীন্দ্রমোহন রূপে দেখবার মূল সমস্যাটি সৃষ্টি করে গেছে। অবশ্য পাশাপাশি এ-কথাও অনেকখানি সত্য যে, 'রবীন্দ্রানুসারী' শব্দবন্ধটি এই সমস্যাকে ঘনীভূত করে তোলার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে

৩

'রবীন্দ্রানুসারী' কথাটি সাধারণভাবে কোন সীমন্তাজ্ঞাপক অভিধা নয়। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যজীবন প্রত্যক্ষভাবে ১৯০৬ থেকে ১৯৩৬, মোট এই একত্রিশ বৎসরকাল বিস্তৃত, যখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে সর্বময় ব্যক্তিত্ব একদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি রবীন্দ্র-সমকালীন কবিও বটে, এবং কোনও রবীন্দ্র সমকালীন কবি রবি রশ্মি দ্বারা স্পৃষ্ট হন নি, ইতিহাস ও কাব্যের আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখলে তার সমর্থন পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব বসু যখন তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারীদের সম্পর্কে তাঁদের রবীন্দ্র-অনুকরণের অনিবার্যতা ও অসম্ভাব্যতার কথা পাশাপাশি উল্লেখ করেন, তখন তিনি তাঁদের কাব্যক্ষমতার সীমাবন্ধনের প্রতিই ইঙ্গিত করেন মাত্র। সন্দেহ নেই যতীন্দ্রমোহনের কাব্যক্ষমতার একটা সীমাবন্ধন ছিল। তিনি যখন সূর্য-স্পর্শে আঙুল পুড়িয়েছিলেন, তখনও সহজ নিঃশ্বাসেই গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর এই গ্রহণের মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না, ফলে আত্মিক সংকটে তিনি কখনো রক্তাক্ত হন নি।

'রবীন্দ্রানুসারী কথাটা যখন ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে একটি গুণগত তাৎপর্যেই লক্ষ্য করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথে কাব্যবিশ্বাসের যে গুণগত পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছিল, সেই পরিমণ্ডলের আবাসিকরাই এইরকম অভিধায় সাধারণভাবে চিহ্নিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রসতীর্থের পথিক রোমান্টিক, তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যভাবনা ও মানবভাবনায় উচ্চারিত, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তিনি কল্যাণধর্মী আস্তিক, চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী ও আদর্শবাদী,

এইরকম কতগুলি গুণগত পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিমণ্ডলটি উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রানুসারীরা, যতীন্দ্রমোহনও স্বভাবতই, এইরকম গুণগত ধ্বনিতে কবিতায় উচ্চারিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও আমরা পাশাপাশি জানি যে, অস্তিবাচক কল্যাণধর্ম, আদর্শবাদ, মানবভাবনা বা মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাস, অথবা সৌন্দর্যসন্ধান,—সমস্তই রোমান্টিক কাব্যলক্ষণের অংশীভূত। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় যখন রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি কখনো কখনো খুব প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়ে, তখনও একথা মনে হতে পারে যে, তাঁর রোমান্টিক কবি-মস্তিত্বের অনুশাসনেই যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রপথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, রোমান্টিকতা কবি মনের একটি প্রবণতামাত্র, কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তার পরিচয় সম্ভবত বিধিবদ্ধ করা যায় না। তথাপি কতগুলি লক্ষণ-মাত্রিক ব্যাখ্যায় রোমান্টিক কবিতার পরিচয় অনুসন্ধানের চর্চা হয়েছে; যদিও এই লক্ষণগুলি কি, তা নিয়ে কোন নির্দিষ্ট সনদ রচনা করা সম্ভব হয় নি। এমন কি, ইংরেজ রোমান্টিকরাও কোন বিধিবদ্ধ ঘোষণাপত্রের অনুশাসনে কবিতা রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন বললেও ঠিক বলা হবে না। লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌-এ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মুখবন্ধ, কোলরিজের বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া, শেলীর ডিফেন্স অব পোয়েট্রি বা চিঠিপত্রে বিকীর্ণ কীট্‌সের নন্দনচিন্তা বিষয়ক মন্তব্যের ভিত্তিতেই অতঃপর রোমান্টিক কাব্যপ্রবৃত্তির ব্যাখ্যা সাধিত হয়েছে, যে ব্যাখ্যার যোগ্যতা তাঁদেরই কাব্যচর্চার জমির উপর দাঁড়ানো। এইসব ব্যাখ্যার সূত্রে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, তাঁরা সাধারণভাবে কবিতার মহনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন; কল্পনাশক্তির গুরুত্বে, আদর্শ ও বাস্তবের সম্পর্ক বিধানে বা কাব্য-অভিব্যক্তির বিবেচনায় তাঁরা ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দিয়েছেন। তথাপি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রন, শেলী বা কীট্‌স্‌—প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবজগতের অধিবাসী ছিলেন, সর্বত্র স্ব-তন্ত্র, এবং কখনোই পরস্পর একাকার হয়ে যান নি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি ও আদর্শ-মনস্কতা, অথবা শেলীর স্বপ্নচারী উর্ধ্বায়নবৃত্তি, দু-ই রোমান্টিকতার স্বরূপসত্যে গৃহীত। রোমান্টিক চেতনার মধ্যে এই ধরনের উদারতার অবকাশ ছিল বলেই, রোমান্টিকতাকে বহুতর লক্ষণধর্মে লক্ষ্য করবার পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়।

এবং, কতগুলি নিরূপিত লক্ষণ ও চারিত্রের ভিত্তিতে রোমান্টিক কবির কাব্যফসল ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়া অনেক সময় বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। রোমান্টিক লক্ষণের কিছু সাধারণ সূত্র যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় চরিতার্থ হয়েছিল, এই তথ্যই যতীন্দ্রমোহনের কবিতা আলোচনার মূল ভূমি প্রস্তুত করে দেয়। রোমান্টিক

কাব্যভাবনার প্রধান প্রসঙ্গ সম্ভবত প্রকৃতি ও মানুষ। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ঐ দুই প্রসঙ্গের পক্ষে যে কোনও কবিতার মূল প্রসঙ্গ হয়ে ওঠা সম্ভব। রোমান্টিকদের কবিতায় ঐ দুই প্রসঙ্গ যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তা তাঁদের মৌলিক উদ্ভাবনাজাত-ও নয়, পূর্ববর্তী কাব্য ও চিন্তার গতিধারাতেই রোমান্টিকরা এর উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন; তাঁদের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা বিষয়টিকে দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতায় আলোকিত করে তুলেছিলেন। রোমান্টিক প্রসঙ্গরূপে গৃহীত প্রকৃতি ও মানুষের সূত্র রুশোর মধ্যে উৎসাবিত হতে আমরা দেখেছি; অন্তত প্রকৃতিচিত্রে মানব-উপযোগিতার সত্য যে তিনি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, এই তথ্যটি স্মরণযোগ্য। এবং রোমান্টিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে আদর্শ মানবভাবনার উপাদানটিও কখনোই উপেক্ষা করা চলে না। প্রকৃতির দর্পণে মানবের কামনা বেদনা যেমন বিম্বিত হয়, তেমনি মানব-দর্পণে প্রকৃতির শিক্ষা ও শক্তি ধরা পড়ে। প্রকৃতি ও মানুষের পরস্পরতা রোমান্টিক দৃষ্টিতে এত ঘনিষ্ঠ যে, দুয়ের বিখণ্ডিকরণ সেখানে প্রায় অসম্ভব। বালুকণায় সমগ্র পৃথিবীকে দেখা, বা বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শনের যে অভিপ্রায়, তার মধ্যে মানুষের চেতনার অনন্ত বিস্তারের সম্ভাবনার চর্চাই মুখ্য. বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি যে আবেগময় আকর্ষণ, সেখানেও মানুষের সত্তার সৌন্দর্যময় নৈতিক অধিকারবোধের প্রেরণাই উচ্চারিত। একথা ঠিক যে, রোমান্টিক চেতনার মেধাবী ভিতর কেন্দ্রে যতীন্দ্রমোহন প্রবেশ করতে পারেন নি, তাঁর আচরণ অনেকটাই বহিরঙ্গ, অনতিগভীর; ইংরেজ রোমান্টিক কবি ও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির পর তাঁকে অতিশয় সরল, চেনা ও সাধারণ বলে কখনো কখনো মনে হতে পারে। তথাপি রোমান্টিক লক্ষণেই প্রকৃতিকে তিনি কাব্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করেছিলেন নিজের সরল ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে।

অন্যান্য অনেক রোমান্টিক কবির মতোই যতীন্দ্রমোহনের কবিতারও একটি প্রধান উপকরণ প্রকৃতি। প্রকৃতিতে বিকীর্ণ মানবের কামনা বেদনা অর্থাৎ হৃদয়ানুভূতির কথাচিত্র এঁকেছেন অনেকগুলি কবিতায়; 'অন্ধবধূ' বা 'কাজলাদিদি' যেমন। 'সিন্ধু উদ্দেশ্যে,' 'পদ্মাতীরে' বা 'হিমালয়'-এ দেখা যাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রাণচেতনার উপলব্ধি বা কখনো মানবীয়ভাবের আরোপ। প্রকৃতির রহস্যময়তায় রোমান্টিক কবিমানসের যে স্বাভাবিক আগ্রহ, বা তার মহনীয়তায় যে বিস্ময়বোধ, এখানে তার পরিচয়ও খুব স্পষ্ট। হিমালয় দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া: 'কল্পনার শেষ কথা—বিস্ময়বারতা', কিম্বা সমুদ্র দেখে তিনি বলে ওঠেন: 'অপার বিস্ময়-সাথে শঙ্কা জেগে উঠে যে পরাণে।' এখানে লক্ষনীয় যে, 'বিস্ময়' শব্দটিকে

অকপটভাবে সরাসরি ব্যবহার করাতেও তাঁর কোন সঙ্কোচ ছিল না। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যধ্যানে প্রকৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছেন 'জ্যোৎস্নালক্ষ্মী'-তে। 'পদ্মাতীরে' কবিতায় খণ্ড প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে বিশ্বের প্রতিভাস লক্ষ্য করেছেন, পদ্মার স্রোতকে 'নিখিলের ধারা-যন্ত্র'-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক উপাদান-স্বরূপ যে ফুল, যতীন্দ্রমোহন সেই ফুল নিয়ে লেখা তাঁর কবিতার অনেকগুলিতেই তুচ্ছ, অনুজ্জ্বল, আপাত-উপেক্ষিত ফলের ওপর রোমান্টিক দৃষ্টির প্রসন্নতায় তাৎপর্য ও অসামান্যতা আরোপ করেছেন। বস্তুত, প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিস্ময় ও রহস্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ, মানবচৈতন্য অনুসন্ধান, রিশ্বধ্যান, সামান্য অসামান্যতার উদ্‌যাপন, জড়ের মধ্যে প্রাণশক্তির আবিষ্কার ইত্যাদি কতগুলি বিচিত্র খণ্ড লক্ষণ রোমান্টিক কবিতায় সচরাচর দেখা যায়, যাকে অনেক সময়েই সাধারণভাবে রোমান্টিক লক্ষণ বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সন্দেহ নেই, লক্ষণমাত্রিক হলেও যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় ভার চিহ্নপাত ঘটেছে। তথাপি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বময় করে প্রকৃতিকে তিনি যে গ্রহণ করতে পারেন নি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই. প্রকৃতপক্ষে খুব কম কবিই তা পারেন। অথচ প্রকৃতি মানুষের অনুভূতি প্রকাশের বিশেষ সহায়ক বলে কবিতা মাত্রেই প্রকৃতি-প্রসঙ্গ ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ থাকে। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায়ও প্রকৃতির বিচিত্র উপস্থাপন আকর্ষণীয়, প্রকৃতিকে একদিকে তিনি যেমন অনুভূতিযাপনের প্রকরণ রূপে গ্রহণ করেছেন, অপরদিকে তেমনি এক পরম নৈতিক শক্তি রূপেও দেখেছেন। প্রকৃতির শিক্ষায় তাঁর মানব-ভাবনা চরিতার্থ সমাধানের অনুসন্ধান করেছে। প্রকৃতিকে তিনি ব্যবহার করেছেন আত্মপ্রকাশে, প্রকৃতিকেই তার কবিতার একমাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে তিনি গ্রহণ করেন নি, প্রকৃতির মধ্য দিয়েই তিনি জগৎ, জীবন ও আত্মলোক আবিষ্কার করেন নি। এই দিক থেকে দেখলে অবশ্য মনে হবে যে যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় প্রকৃতি একধরণের সীমার শাসন মেনে চলেছে, উপকরণমাত্রতাকে অতিক্রম করে তার সর্বসায়ী অস্তিত্ব নিরূপিত হতে পারে নি।

এমন কি তাঁর পল্লী-মনস্কতার ব্যাপারটি নিয়েও একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। রোমান্টিক দৃষ্টিতে পল্লী ও প্রকৃতির সরলতা ও মাধুর্য কাঙ্খিত. প্রায় একটা স্বাভাবিক অধিকারের ক্ষেত্র, সেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, মীমাংসিত ও মৌলিক ক্ষেত্রটি আদর্শ প্রায় হয়ে ওঠে। এক ধরণের বিচ্ছিন্নতার বোধ থেকেই এই আদর্শ ভাবনার সম্ভাবনা গড়ে ওঠে। তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের একটা

বড় অংশই পল্লী ও প্রকৃতির সহজরসে স্নান করতে চেয়েছিলেন, প্রকৃতিগত জীবনের অন্তর্গত হয়ে আত্মযাপন করেছিলেন, এবং এই লক্ষণটিকে রোমান্টিক বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রতিক্রিয়াজনিত একটি প্রবণতা রূপে লক্ষ্য করবার উপযুক্ত একটি ভূমিও হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়। যতীন্দ্রমোহনের পল্লীমনস্কতার ব্যাখ্যাও সরল হয়ে যায় ব্যাপারটিকে যদি এই প্রবণতার ধর্মে সমর্পণ করি। সমকালের অন্যান্য অনেক কবির মতোই যতীন্দ্রমোহনের পল্লী ও প্রকৃতি বা প্রকৃতি নির্ভর জীবন নিয়ে লেখা কবিতায় তথাপি বিচ্ছিন্নতার চেতনা যে খুব স্পষ্ট আর্তিতে উচ্চারিত, এমন কথা হয়তো বলা যাবে না, এবং এই নিয়ে অবশ্যই এক ধরণের অভাববোধ থেকে যায়। পল্লীর আইডিয়ালিসেশ্যন যদি বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যে সম্পন্ন না হয়, তাহলে তার পেছনে রোমান্টিক মনোভঙ্গির ক্রিয়াশীলতার ব্যাপারটি অবশ্য মেনে নিতে হয়। কিন্তু এইরকম ক্ষেত্রেও রোমান্টিক বিষাদের যোগ প্রত্যাশিত থাকে, যতীন্দ্রমোহনের পল্লী মুগ্ধতায় যে যোগটি প্রায় অচিহ্নিত। এই নিয়েই তার পল্লী মনস্কতার ব্যাখ্যায় একটা সমস্যা গড়ে ওঠে। হয় তাকে রোমান্টিক বৃত্তির স্বচ্ছ সরল ব্যাখ্যা করতে হয় সমস্ত সংশয় এড়িয়ে গিয়ে, নতুবা শিল্প-মনস্তত্ত্বের জটিলতার বাইরে রেখে তার পরিচয় নিতে হয় শৈশব-সরল মুগ্ধতায়। মনে হয়, একটা অবজেক্টিভ প্যাটার্নের মধ্যেই এই ধরণের ব্যাপারগুলি বাঁধা পড়ে আছে।

৪

কিন্তু রোমান্টিকরা সচরাচর মানুষকে দেখতে চান একটি বিশ্বজাগতিক মূল্যবোধের আলোকে, মানুষ সেখানে স্বপরিচয়ের গণ্ডিরেখাকে অতিক্রম করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রতি দেশ ও কালের মানুষের একটা নিজস্ব পরিচয়-পরিধি থাকে, অথচ কবি তার বন্ধনের বৃত্ত থেকে তাকে বাইরে টেনে আনেন, দেশ ও কালের রেখা লুপ্ত করে তাকে স্থাপন করেন অপরিমেয়তার ভূমিতে, যাকে প্রধানত গুণগত একটি তাৎপর্যেই দেখা যায়। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় স্বভাবতই এই ধরণের একটি প্রবণতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, খোলা চোখেই আমরা দেখতে পাই তিনি নির্বাচন করে নিচ্ছেন কিছু মানুষ, তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে, এবং তাঁর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা কল্পনার ভূখণ্ড থেকে তারা নির্বাচিত হয়ে আসছে। তিনি তিরিশের দশকের কবিদের মতো ভূগোলের

সীমাকে অবারিত করতে পারেন না, দেশজ সাংস্কৃতিক সঙ্গতির বাইরে যেতে চান না, এবং এই শতকের কবি হয়েও ব্যাপ্ত বিশ্বের অধিকার থেকে নিজেকে সবিয়ে রাখেন। হতে পারে এটা ইচ্ছাকৃত, তার নিজস্ব বিবেচনার শাসন, অথবা হতে পারে এরই মধ্যে ধরা পড়ে আধুনিকতার কুললক্ষণের একটি অভাবাত্মক দিক, যাকে পেরিয়ে আসা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

আসলে মানুষ নিয়ে যখন তিনি কবিতা লেখেন, তখন তাঁর সমস্ত একাগ্রতা ঘনীভূত হয় গৃহীত চরিত্রের আইডিয়ালজেশনে, সেই চরিত্রকে অবলম্বনে আত্মসংকট বা আত্ম-সন্ধানের চর্চায় মুক্তি খোঁজেন না। তাঁর আগ্রহ যতটা নির্মাণের, ততটা আত্মযোগের উন্মোচনে নয়। এই যোগ কিভাবে স্থাপিত হবে তার মীমাংসা পাঠকেই করে নিতে হয় অবশ্য, কিন্তু সমস্যাটির জটিলতা অগ্রাহ্য করা যায় না। কবি স্বভাবতই কবিতা লেখার সময় কোনও না কোনও রকমে যুক্ত হয়ে যান বিষয়ের সঙ্গে, এবং যতীন্দ্রমোহনও চরিত্রব্যাখ্যায় এক ধরণের মানবযোগে সম্পৃক্ত। মানুষের প্রতি এক প্রীতিপ্রসন্ন মনোভাবে এই ধরণের কবিতার প্রসাধন রচিত হয়ে গেছে, যে-কোনও চরিত্রই যেন প্রত্যক্ষ মানব ব্যক্তিত্ব রূপে লক্ষনীয় হয়ে উঠতে চায়। তিনি যে পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে কিছু কবিতা লিখেছিলেন, যেমন ভীম, শবরী বা কংক নিয়ে লেখা কবিতা, তার ভিতর তরঙ্গে পৌরাণিক কাহিনী বা সর্বব্যাপী নীতিলোক নিয়ে কবির ভাবনা প্রায় অনুপস্থিত, অথচ মানব চরিত্র রূপে ব্যক্তিত্বে অনুসন্ধানে তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত প্রকাশ্য। মানুষ রূপেই চরিত্রকে দেখতে চান কবি, ন্যায়-অন্যায়ে, দুঃখে-সুখে, সংকটে-পরিত্রাণে যে মানুষ, তাকে লক্ষ্য করাতেই কবির মনোযোগ প্রধান। জীবনে যেখানে সফলতা বিফলতার সীমানা অভ্রান্তভাবে টানা যায় না, মানুষের অন্তর্লোকে এক ধরণের সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে তখন, আর কর্ণ মানুষের সেই অসহায় রক্তক্ষরণের প্রতীকী দৃষ্টান্ত। চূড়ান্ত নীতি মানব জীবনে যখন নির্দ্ধারিত নয়, তখনও কিছু খণ্ড মানব নীতি থাকে, যা অসম্পূর্ণ হলেও জীবনে আচরনীয়, কিন্তু সেই সামান্য আচরণীয় যখন উপেক্ষিত হয় তখন একটা পরাভবের বোধ ঘন হয়ে ওঠে তাতে, অথচ তাতে বাতিল হয়ে যায় না সেই আচরনীয়ের যোগ্যতা, —দুর্যোধনের চরিত্রের মধ্যে সেই খণ্ডনীতির যোগ্যতা ঘোষণা করতে গিয়ে এক অসহায় পরাভববোধের ছবি এঁকে গেলেন। অথবা তিনি উপহার দিলেন যে শবরীকে, সে প্রেমের আগুনে পুড়তে পুড়তে পৌঁছে গেছে পূজার উপলব্ধির জগতে, আপন সাধনবেগে যে বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে সত্য কোন নিরালম্ব ব্যাপার নয়, তা

সত্যস্বরূপ হয়ে ওঠে মানব-উপলব্ধিরই মাধ্যমে। দুর্যোধন, কর্ণ বা শবরী, যতীন্দ্রমোহন যখনই যে চরিত্র অনুসন্ধান করেছেন, তার উত্থাপন করেছেন চরিত্রের মানব সম্ভব শক্তির আলোকেই।

সন্দেহ নেই, পুরাতনের নবীন রচনা যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রসাধন পায়, তা নূতন কালেরই অর্জন, কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের এই রকমের কবিতাগুলি তথাপি নূতন সময়ের নিশ্চিত-চিহ্নে গড়ে ওঠে না বলেই মনে হবে। যে-সময়ে পুরাতনকে নূতন করে নির্মাণ করা হয়, সেই সময়ের একটি অনুভববেদ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিপ্রেক্ষিত অথবা ভূমি যদি কবিতার মধ্যেই গড়ে না ওঠে, তাহলে সমস্ত আয়োজনের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন এসে পড়ে। নিতান্তই একটা গল্প বলা হলো অথবা একটি চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হলো, এই রকমের যুক্তি যদি তৈরী করা হয়, তাহলে অবশ্য বলবার কিছু থাকে না। কিন্তু এই ধরনের রচনায় সময়হীনতার চেতনা যদি সৃজনের সক্রিয় শক্তি না হয়ে ওঠে, আমরা কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। যতীন্দ্রমোহনের 'মহাভারতী'র অনেকগুলি কবিতাই বাহ্যত আন্তরিক ও মনোযোগী, তথাপি মাঝে মাঝে অত্যুৎসাহ বিশৃঙ্খল. কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে সময়ের মুক্তি সম্পর্কে চেতনার অনুপস্থিতি, এবং এই চেতনার স্বভাব প্রধানত বুদ্ধিগত। আবেগ দ্বারা প্রায় আচ্ছন্ন এই কবির মধ্যে সম্ভবত প্রকৃতিগত কারণেই এই ধরণের কবিতার আধুনিক সঙ্গতি আমরা খুঁজে পাই না। শুধু মানবভাবনার আলোকে দূর অতীতকে দেখতে চেয়েছিলেন বলেই কি তাঁর এই কবিতাগুলি কৃতিত্বসূচক? রামচন্দ্র যেখানে অবতার, তার কল্পনার মধ্যে শিল্পসৌন্দর্যের যে পরিচয় থেকে যায়, তা কি আমরা সত্যিই বাতিল করতে পারি?

আসলে মানবভাবনাকে একটি সরল রোমান্টিক লক্ষণে যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করেছিলেন। এই লক্ষণের মধ্যে তিনি বেঁধে রেখেছেন তাঁর কবিতা, তার মধ্যে কোন জিজ্ঞাসা ছিল না যা আগুনের মতো জ্বলে বা যার মধ্যে ব্যাপ্তি আছে। তিনি 'জেলের ছেলে,' 'জেলের মেয়ে', 'চাষার মেয়ে', 'মালোর মেয়ে,' ইত্যাদি কবিতা লিখলেন, কিন্তু এইসব কবিতায় জেলে, চাষা বা মালো কখনোই শ্রেণী-চিহ্নে চিহ্নিত হলো না, বোঝা যায় এই শ্রেণীচিহ্ন কখনোই কবির মনোযোগের আকর্ষণবিন্দু হয়ে ওঠে নি। অথচ এরই মধ্যে ছিল একটা সঙ্কটের আগুন, যার মুখোমুখি এসে তিনি প্রায় দাঁড়িয়েছিলেন, যেখান থেকে তাঁরা মানবভাবনা শুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতো। রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সঙ্কট' লিখেছিলেন. কিন্তু 'আমির'

জানি যে প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ মানবভাবনার দলিল। সঙ্কটের দাহই ভাবনাকে শুদ্ধ করে দেয়। যতীন্দ্রমোহন বিস্ময়করভাবে এড়িয়ে গেলেন এই সঙ্কটের চেতনা, ভাবনাকে পরখ করলেন না, নির্মাণ করলেন না; প্রকাশ করে গেলেন ভাব, যা একটি সুখকল্পনার মতো তৃপ্তিকর। কবিতাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন মানব-হৃদয়ের চিরকালীন উন্মোচন জাতীয় একটা ফর্মুলায়। আরেক দিক থেকে বলা যায়, এই সব কবিতায়,—চাষা, জেলে বা মালো শ্রেণীর নরনারী, যাদের জীবন সচরাচর উপেক্ষিত ও তুচ্ছ, তাদের সেই তথাকথিত সামান্যতার মধ্যে মানব-হৃদয়ের যে বাঞ্ছিত অধিষ্ঠান ও অধিকার আছে,—কবি তাই দেখাতে চেয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে কবির অভিপ্রায় বোঝা যায় অবশ্য, রোমান্টিক ভাবের অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে যা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়েই কবিস্বভাবের একটি পরিচয় আমরা চিনে নিতে পারি বোধহয়। কবি সব সময়েই তাকিয়ে আছেন বিষয়ের দিকে, এবং বিষয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠায় তিনি সহৃদয় একটি ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। তিনি কখনোই লুপ্ত হতে দিতে চান না তাঁর বিষয়কে, অথচ এই নির্বাপণ সম্ভব না হলে কবি-ব্যক্তিত্বের মর্মলোকের উচ্চারণ আমরা শুনব কেমন করে? কবি-ব্যক্তিত্বেরই কবিতার বিষয় হয়ে ওঠার সাধনা উনিশ শতকের গীতিকবিতায় শুরু হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মীমাংসা তখনো হয় নি। তখনো বাংলা গীতিকবিতায় বিষয়মুখী কল্পনার লক্ষণটি প্রধান, রবীন্দ্রকালে রবীন্দ্রানুসারী কবি যতীন্দ্রমোহন কবিতা লিখতে গিয়েও বিগত শতাব্দীর সেই উত্তরাধিকারকে অনেকগুলি ক্ষেত্রেই বহন করে গেছেন। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যাঁদের আমরা 'রবীন্দ্রানুসারী' কবি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছি, তাঁদের কবিতার একটি বড় অংশই বোধহয় আমাদের দেখিয়ে দিতে চায় যে তাঁরা প্রকৃতিগত দিক থেকে অধিকতর ঐতিহ্যানুসারী, উনিশ শতকীয় বিষয়াশ্রিত কল্পনার উত্তর সাধক, রবীন্দ্রনাথের তৈরী রাজপথের পাশাপাশি সেই পুরনো পথে চলতেই যাঁরা বেশি সচ্ছন্দবোধ করেন।

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ । রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর এই প্রতিষ্ঠাকে সমকালীন লোকপ্রিয়তামাত্র বলে দেখলে নির্মল বিবেচনার পরিচয় দেওয়া হবে না, কেন না কোন প্রতিষ্ঠাই ভূমিহীন বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়। নজরুলের প্রতিষ্ঠার মূল সত্যটি কেবল সমকালের অনুকূলতা নয় ; কোন কবি যে চিহ্নিত হয়ে যান তার কারণ তাঁর চারিত্র্য, তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। যে-কোন কবিকেই এই চারিত্র্য অর্জন করতে হয়, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়ে ওঠার শর্তটিকে পূরণ করতে হয়। আর কবির কণ্ঠস্বরের নিজস্ব ও তাঁর কবি-চরিত্র যে প্রায় সমার্থক, একথা বললে খুব ভুল হয় না।

টি এস এলিয়ট একবার জানিয়েছিলেন যে কবিতায় এজরা পাউণ্ড কি বলছেন তার চেয়ে তিনি কিভাবে বলছেন তার প্রতি তাঁর মনোযোগ বেশি। বলা বাহুল্য, এই কথা বলে তিনি বিষয়গৌরবকে ছোট করে দেখতে চান নি, তিনি বরং মনে করতেন যে বিষয়রিক্ততা প্রকাশকে কখনোই উজ্জ্বল করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, প্রকাশরীতি বা উচ্চারণবিধি অনুসরণ করা এক অর্থে বিষয়পরিধিকেই অনুসন্ধান করা। নজরুলের কবিতার বিষয় সম্পর্কে আমাদের কতকগুলি পূর্ব-নির্দিষ্ট সংস্কার আছে এবং এই সংস্কারগুলি সাধারণভাবে প্রতারক। সমকালীন জাগ্রত জাতীয় চৈতন্যের দিনগুলি অবশ্যই তাঁর রচনার পটভূমিরূপে উপস্থিত ছিল, কিন্তু এর চেয়ে গুরুতর ভ্রান্তি আর কিছু হবে না যদি অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনকেই তাঁর কবিতার বিষয় বলে নিরূপণ করা হয়। অথচ এইরকম যে প্রায়ই করা হয়ে থাকে, তা-ও সত্য। এর কারণ সম্ভবত পূর্বাহ্নেই বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ছকে নিয়ে কবিতার বিচার নিষ্পন্ন করার পদ্ধতিকে ব্যবহার করা। তাঁর কবিতার উচ্চারণ অনুসরণ করবার পদ্ধতিকে প্রথমেই গ্রহণ করলে নজরুল সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ লাভ করা যেতে পারে যা তাঁর চরিত্র উন্মোচনের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। বস্তুত কবিতার বিষয় বলে যদি কিছু থাকে তা-ও এই চরিত্র, অর্থাৎ তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। নজরুলের সেই কণ্ঠস্বর, তিনি কিভাবে কথা বলছেন, তা সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করে দেখলে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

নজরুলের উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে গেলে সবার আগে তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি কিভাবে কথা বলছেন, যে কোন কবি সম্পর্কে বিবেচনার ক্ষেত্রে এই জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণ প্রায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর এই ধরণের অনুসন্ধানে, অর্থাৎ তাঁর উচ্চারণ-রীতি বিশ্লেষণে সম্বোধিত পক্ষের প্রসঙ্গও অবশ্যই উত্থাপন করতে হয়। যে কোন কবিতাই কোন-না-কোন রকমের সম্বোধন; সম্বোধন খুব প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকলেও কবিতা যে 'ওড'-কবিতার ধর্মে সমর্পিত হবেই, এমন কোন নির্দিষ্টতা নেই। কিন্তু কবিতায় কবিকে কথা বলতেই হয় যখন, তখন তিনি অবশ্যই কারো সঙ্গে কথা বলেন। তিনি প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, অথবা প্রেমের সঙ্গে, এমন কি প্রকৃতি, ঈশ্বর বা প্রেরণার সঙ্গেও। এই সম্বোধনের সূত্রটি যে-মুহূর্তে গৃহীত হয়, সেই মুহূর্তে সম্বোধিতের প্রসঙ্গটিও গুরুতর হয়ে ওঠে। কাব্য-নির্মাণে পাঠককুলের ভূমিকা ও অধিকার নিয়ে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় ঢের বিতর্ক-বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই অবশ্যম্ভাবী শক্তির স্বাধিকার তথাপি অপরাভূত থেকেছে। প্রকৃতপক্ষে, কবিতার উচ্চারণ বিচারে কবির সম্বোধন-রীতি ও কবিতার পাঠক প্রসঙ্গ বিবেচনার এক জরুরী অংশ হয়ে ওঠে।

২

নজরুলের সম্বোধন সরলভাবে অতিশয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। 'বল বীর/বল উন্নত মম শির!/শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!'—নজরুল এইভাবে যখন কথা বলেন, তখন একথা বুঝতে আমাদের কখনো কষ্ট হয় না যে তিনি কোন বীর ব্যক্তিকে আত্মঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করতে চান; কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ১৬১ পংক্তি-দীর্ঘ এই কবিতায় একই সঙ্গে সম্বোধক ও উদ্বোধক 'বল' শব্দ মাত্র ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে; 'অথচ আমি' শব্দ এখানে অন্তত ১৪৫টি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। এই শব্দ দুটির ব্যবহারে আনুপাতিক হেরফের এত বেশি যে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্বোধনের ক্ষেত্র সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। যাকে প্রাথমিক ভাবে সম্বোধনের ক্ষেত্র বলে মনে হয়, কাব্যপাঠের পর আর সন্দেহ থাকে না যে ইতিমধ্যে তার ক্ষেত্র-পরিবর্তন ঘটে গেছে: কবি নিজেকেই এখানে সম্বোধন করেছেন, আত্মশক্তির উপলব্ধি, উদ্বোধন ও তার ঘোষণায় তিনি এখানে অস্থিরভাবে তৎপর। অথচ পাশাপাশি এই তথ্যটিও উপস্থিত যে, দ্বিতীয় কোন বীর ব্যক্তিকে সম্বোধন করার মত করে তিনি 'বল' শব্দটি অন্তত ৮ বার অতি অকপট ও বিশিষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন। এবং এই

ব্যবহার আবেগবিদ্ধ হয়েও অসতর্ক নয়। একই কবিতায় সম্বোধনের ক্ষেত্র-পরিবর্তন সচরাচর শাস্ত্র মার্জনায় উপেক্ষিত হয়, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রটি একটু আলাদা। এখানে নজরুল যে অহং-চর্চা করেছেন, তাতে অন্যতর কোন ব্যক্তিকে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন বলেই সম্বোধনের প্রাথমিক রূপটি এইরকম সরল প্রত্যক্ষতায় ব্যবহৃত রয়েছে। 'ব্যক্তি' অমিত শক্তিধর; ব্যক্তিকবি আত্মশক্তির চর্চা করেছেন এবং যে কোন 'ব্যক্তিই' আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত হবেন, এটাই কবির প্রধান অভিপ্রায়। 'বিদ্রোহী' কবিতার সম্বোধনরীতিতে আপাত-বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বস্তুত কোন হানিকর অসতর্কতার পরিচয় নেই, পক্ষান্তরে তা কবির এই মনোভাবেরেই প্রকাশক। 'বিদ্রোহী' কবিতার উচ্চারণ রীতির এই কাঠামোটি অনুসরণ করলে একটি বিষয় অন্তত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে: কবি নিজে আত্মানুশীলণে ব্রতী এবং পাঠক কবির এই আত্ম অভিজ্ঞতার শরিকানা লাভ করছে। কাব্যবিচারে কবি ও পাঠক, এই দুইটি পক্ষ কল্পনা করে নেওয়াতে সম্ভবত অনেকেই আপত্তি করবেন না; কিন্তু নজরুলের কথা বলার রীতি যে এখানে অনেকখানি ঘোষণাধর্মী, তা নিয়ে হয়তো কোন প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখা দরকার যে, এই ঘোষণা একপাক্ষিক নয়, দুই পক্ষে বিবৃত, যার ফলে মোটামুটিভাবে এক ধরণের সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এই একই রীতিতে 'অগ্রপথিক' (জিঞ্জীর) কবিতার সম্বোধনে তিনি মিশ্ররূপ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

নজরুলের কবিতায় সম্বোধনরীতিতে সর্বত্রই যে এই ধরণের মিশ্র চমৎকারিত্ব প্রতিশ্রুত হয়েছে, এমন নয়: বরং অনেকগুলি ক্ষেত্রেই সম্বোধনের সরল-প্রত্যক্ষতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন: 'ফরিয়াদ' (সর্বহারা) কবিতায় আদি পিতা ভগবান'কে সম্বোধন। এইরকম আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত: 'দারিদ্র্য' (সিন্ধুহিল্লোল) কবিতায় হে দারিদ্র্য, তুমি মোর করেছ মহান!' 'সিন্ধু' (সিন্ধুহিল্লোল) কবিতায়, হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর/হে মোর বিদ্রোহী!' 'মরণ-বরণ' (বিষের বাঁশী) কবিতায়, 'এস এস এস ওগো মরণ!' 'যৌবন' (প্রলয়শিখা) কবিতায়, 'ওরে ও শীর্ণা নদী,/দু' তীরে নীরাশা বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি?' ইত্যাদি। নজরুলের কবিতার সম্বোধন-রীতিতে আরেকটি রূপ খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সব ক্ষেত্রে সূচনার সম্বোধন সাধারণভাবে প্রতারক, যেমন:'বারাঙ্গনা (সাম্যবাদী) কবিতা। কবিতাটির আরম্ভ এই রকম: 'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে?' এখানে সম্বোধন খুবই স্পষ্ট, কিন্তু বারাঙ্গনাকে সম্বোধন করে কবিতার সূচনা হলেও, বারাঙ্গনাই যে অপরের কাছে আপন অধিকারের কথা

জ্ঞাপন করছে, তা কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে এসেই প্রাঞ্জলভাবে ধরা পড়ে। 'পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার ?'—বারাঙ্গনা যখন এইভাবে আপন অধিকারের কথা প্রকাশ করে, তখনই সূচনার সম্বোধনের ওপর আর নির্ভরশীল থাকা সম্ভবপর হয় না। আপাতসম্বোধিতই এই কবিতায় সম্বোধনের স্থান অধিকার করে নেয়। 'কৃষাণের গান' (সর্বহারা) কবিতার আরম্ভটিও এই রকম : 'ওঠ্‌রে চাষী জগদ্বাসী ধর্‌ কষে লাঙল'। অথবা 'শ্রমিকের গান' (সর্বহারা) কবিতার সূচনা : 'ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী-দল !/ ধর হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল'। কিন্তু অচিরাৎ 'কৃষানের গান' কবিতার দ্বিতীয় পংক্তিতে, ও শ্রমিকের গান' কবিতার তৃতীয় পংক্তিতে পৌঁছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে সম্বোধিতই প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্বোধকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'কৃষাণের গান'-এর দ্বিতীয় পংক্তি : 'আমরা মরতে আছি— ভাল করেই মরব এবার চল্‌'। বা 'শ্রমিকের গান'-এর তৃতীয় পংক্তি থেকে এইরকম আছে : 'আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই / পায়ের সুখে ভাঙব চল্‌। নজরুলের কবিতার সম্বোধন-রীতির কয়েকটি মাত্র বিশিষ্টতার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। কিন্তু সাধারণভাবে প্রায় সব কবিতাতেই যে পাঠক অলিখিতভাবে সম্বোধিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য উল্লিখিত বিশিষ্ট কতকগুলি সম্বোধন-রীতি নজরুলের কবিতাকে কিভাবে ও কতখানি সমৃদ্ধ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে ; কিন্তু এই ধরণের বিশিষ্টতা যে অনেক সময় অতর্কিত চমক ও চমৎকারিত্ব; দুই-ই সৃষ্টি করতে পারে, নজরুলের কাব্যপাঠে অন্তত সেইরকম অভিজ্ঞতা হয় এবং এই সূত্রে কবিতায় এক ধরণের নাট্যশক্তি যে কোন-না-কোন রকমভাবে অংশত সঞ্চারিত হয়ে যায়, তা-ও অনাস্বাদিত থাকে না।

৩

এই প্রসঙ্গেই অবশ্য কবিতাবিচারে কবি ও পাঠকের পরস্পরতার কথাটি উল্লেখ করা চলে। যে কোন কবিতার সম্বোধন সাধারণভাবে পাঠকের উদ্দেশেই। কোন কোন সমালোচক যে কবি, পাঠক, ও কাব্যভাবের ত্রিকোণের কথা বলেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। পাঠক বা তথাকথিত সম্বোধিতের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কাব্য-বিবেচনায় সব সময়েই থেকে যায়, কেন না এই উপাদানটি প্রবলভাবেই কাব্য-প্রকরণের অংশীভূত। যখন কবি একটি মনোভাব উচ্চারণ করেন, সেই মনোভাব উচ্চারিত অবস্থায় কবির ব্যক্তিত্ব থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ উচ্চারিত যে কোন অবস্থাই ব্যক্তিনিরপেক্ষ। কবিতার

এই নিরপেক্ষতা গুণটিই বিশ্বজনীনতার ভিত্তি, এবং এই সূত্রেই পাঠক-উপাদানটি কাব্যরচনার সংলগ্ন হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন: 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া/ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ'। বা, 'সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।/ওরে আয়/ আমায় নিয়ে যাবি কে রে/ দিনের শেষে শেষ খেয়ায়।' (শেষ খেয়া/খেয়া), তখন এই অনুভূতি ও আর্তি দুই-ই যে কবির, আমাদের তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না; কিন্তু পাশাপাশি একথাও তো সত্য যে রবীন্দ্রনাথের এই আর্তি ও অনুভূতি রচিত অবস্থায় অনেকখানিই তাঁর ব্যক্তিগততার নিশ্চয় থেকে বিচ্যুত, কেন না উচ্চারিত মুহূর্ত অনুভবের দ্বিতীয় অনুভবের মুহূর্ত। প্রথম অনুভবের মধ্যে ব্যক্তিগততা যত সমগ্র, নিশ্চয় ও অনিবারণীয়, দ্বিতীয় অনুভবের ক্ষেত্রে তা অংশত ফিকে হয়ে যেতে বাধ্য। বস্তুত যে কোন কাব্যসৃষ্টি তার রচিত অবস্থায় কবি-'ব্যক্তি' থেকে খানিকটা সরে আসে, কাব্যপ্রচেষ্টার মধ্যেই ব্যক্তির আত্মত্যাগের ইতিহাস সংরক্ষিত থাকে। কাজেই রচিত কবিতায় কবির 'ব্যক্তি' যতখানি উন্মীলিত, নৈর্ব্যক্তির উন্মোচনও আংশিকভাবে বা ঠিক ততখানি প্রতিশ্রুত, অর্থাৎ, কবিতায় কবির 'ব্যক্তি' সংরক্ষিত ক্ষেত্রে উপস্থিত মাত্র। আবার, এই কবিতা যখন পঠিত হয়, তখন সেই কবিতার অধিকার পাঠককে বর্তায়, এমন কি কবি স্বয়ং-ও যদি পাঠক হন, তখন তিনি পাঠকই মাত্র, কবি নন। এবং এইখানে এসে কবিতা সম্ভবত কবি-'ব্যক্তি' থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কবি যখন লেখেন: 'কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?/হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।' (সাম্যবাদী/সাম্যবাদী), তখন কবি নজরুলই পংক্তি দুটির রচয়িতা সন্দেহ নেই, কিন্তু পংক্তি দুটি যখন নজরুল ইসলাম বা অন্য যে কোন পাঠক পড়ছেন, তখন তা তাঁরই উচ্চারণমাত্র। অথবা: 'আমি বেদুঈন আমি চেঙ্গিস্, আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'—যখন পাঠক পড়েন, তখন 'আমি' আর কবি নজরুল অপৃথক থাকে না, পাঠকই কবিতার 'আমি' হয়ে ওঠেন; পাঠক কখনো 'নজরুল বেদুঈন, 'নজরুল চেঙ্গিস্' পড়বেন না বা ভাববেন না। কবির দিক থেকে এ এক অসহায় অবস্থা; নিজের অনুভূতি, অথচ লিখতে গিয়ে নিজেকে হারাতে হয় কতকটা, আর লিখিত অবস্থায় তার ওপর নিজের অধিকার থাকে না। এমন করুণ অভিজ্ঞতায়ও যে কবির আনন্দে সামান্য ঘাটতি পড়ে না, তা পক্ষান্তরে প্রমাণ করে যে, কবিতার পাঠকেই কবির আনন্দ তথা কবিতার কৃতার্থতা। ফলে কাব্য-বিবেচনায় কবিতার পাঠকের অধিকার ও ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে এবং বলা যায়,

পাঠকই কাব্য-প্রয়াসের চূড়ান্ত ফল। বস্তুত কবিতা যখন রচিত হয়ে যায়, এবং কোন পাঠক কবিতাটি স্পর্শ মাত্র করে না, কবিতার সেই অবস্থাটি সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থা, অনেকটা জড়বস্তুর মত যা ব্যবহার ছাড়া ভারপিণ্ডমাত্র। লিখিত অবস্থায় একখানি নাটক, অর্থাৎ একখানা নাট্য-পুঁথি যেমন পাঠক-নিরপেক্ষ বা মঞ্চ-নিরপেক্ষ অবস্থায় নিরর্থক ও শ্রেণীচ্যুত, কবিতার এই অবস্থাও অনেকটা সে-রকম। পাঠকের স্পর্শেই কবিতার শিল্পমুক্তি সম্ভব।

এই পাঠক-উপাদানটি যখন কাব্যনির্মাণে ও কাব্যবিচারে অনিবারণীয় বলে গ্রহণ করা হয়, তখনও কিন্তু পাঠকের সমস্যা মেটে না। প্রকৃতপক্ষে, কবিরা অথবা কবিতা-শিল্পের আপোষহীন সমর্থকরা পাঠকের সমস্যা নিয়ে বার বার তিক্ত হয়ে উঠেছেন, এই তিক্ততা থেকে কখনো কখনো ক্রোধও দেখা দিয়েছে। একে এক ধরণের অসহিষ্ণুতা বলে মাঝে মাঝে মনে হয় বটে, তথাপি একথা স্বীকার না করেও উপায় নেই যে, পাঠকে নিবেদিত হয়েও কবিতা পাঠকের কাছ থেকে সব সময় সুবিচার পায় নি, পাঠক-জগতে অনেক সময় দুঃখজনক প্রতিরোধ বা প্রত্যাখ্যান সূচিত হয়েছে। এই থেকেই পাঠক-সমস্যার উৎপত্তি। কবিতার সঞ্চারণশক্তি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কতকগুলি সংস্কার সচরাচর পাঠকদের মধ্যে থাকে, এই সমস্যার মূল উৎস সম্ভবত সেইখানে।

যে কোন কবিতারই উপস্থিত পাঠক থাকেন; কিছু থাকেন যাঁরা পরিশীলিত প্রস্তুত, কিছু থাকেন আভ্যাসিক এবং এই শেষোক্ত কুলই বড় অংশ। কবিতার ওপর প্রত্যক্ষ বা নেতি পথে এঁদের প্রভাবই সর্বাধিক। এই বড় শরিকের অভ্যাসের আঘাতেই কবিতার সংস্কারমুক্তি বা শিল্পমুক্তির বিচিত্র আন্দোলন কবিতার ইতিহাসে বার বার দেখা দিয়েছে। আর এই তথ্যও খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে একসময়ের প্রত্যাখ্যান অপর সময় অভ্যাসে পর্যবসিত হয়েছে। আবার এক ধরণের কবি ও কবিতার সমর্থক আছেন, যাঁরা অভ্যাসের অমর্যাদা করেন না। অনেক সময় এই ধরণের অভ্যস্ত রুচির কবিতা ভর্ৎসিত হয়ে থাকে। বস্তুত পাঠকদের দুটো ভাগ আছে: অব্যবহিত পাঠক ও দূরবর্তী পাঠক। কোন কবিকে আবার কবিতা লেখার সঙ্গে পাঠক তৈরির কাজেও অধ্যবসায়ী হতে হয়, আবার কোন কোন কবি প্রস্তুত পাঠক পান। সাধারণভাবে অবশ্যই মনে হবে যে, শেষোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবিদের অবদান কাব্যশিল্পে অনেক বেশি।

এই পর্যন্ত আলোচনায় অন্তত দুটো বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে: এক, কবিতায় পাঠক এক অপরিহার্য উপাদান; দুই. কবিতার এই পাঠক-উপাদান

বিষয়ে জীবন্ত সমস্যাও আছে। কাব্যবিবেচনার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে তার কবিতায় নজরুল কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, অতঃপর তা লক্ষ্য করা দরকার; এই সূত্রে নজরুল সম্পর্কে অনেকগুলি অলস ধারণার পরীক্ষাও হয়ে যেতে পারে।

৪

পাঠক সম্পর্কে তাঁকে কখনো ভাবতে হয় নি: নজরুল সম্পর্কে যখন এই কথা বলা হয়, তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁকে পাঠক তৈরির কাজে নামতে হয় নি, তিনি প্রস্তুত পাঠক পেয়েছিলেন। অথবা: পাঠকের অভ্যাসকে তিনি আহত করেননি, বরং কবিতায় তিনি অভ্যস্ত রুচি ও রীতিরই পরিপোষণা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরণের কথা আপাতদৃষ্টিতে খুব সাধারণ ও অকপট বলে মনে হলেও, এই সরল নিরীহতার অন্তরালে এখানে কবির প্রতি ভৎসনাই বরাদ্দ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে এই ধরণের আপোষধর্মী কবিরা জনপ্রিয় কবিতা রচনা করে তাৎক্ষণিক সাধুবাদ আত্মসাৎ করে নিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের কবিতায় শিল্প-সঙ্কিৎসার প্রতি মনোযোগের অভাব খুবই প্রকট, ফলে, কাব্যের ইতিহাসে তাঁদের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় না। এই রকম ধারণার প্রতিবাদ করবার কোন প্রয়োজন নেই, কেন না তা বালভাষণ না হয়েও অতিরেকস্পৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, যে-কোন কবি সম্পর্কে আলোচনায় সবচেয়ে আগে তাঁর কবিতার পরিপ্রেক্ষিতটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। নজরুল ইসলামের কবিতা যে পাঠক পেয়েছিল তার কারণ তাঁর কবিতার তথাকথিত বিষয়; আবার পাশাপাশি এ-কথাও আমাদের মনে রাখা ভালো যে, এক অখ্যাত হাবিলদারের অকপট এক কবিতা যে মোহিতলালের সম্বর্ধনা লাভ করেছিল, তার কারণ: তাঁর কবিতার উচ্চারণ গৌরব। আরো মনে রাখা দরকার, 'বিদ্রোহী' মিথ্-এ বাংলা দেশ নজরুলকে তখন পর্যন্ত স্থাপন করে নি। নজরুলের কবিতার 'বিষয়' তাঁকে অনায়াসে পাঠক দিয়েছিল সন্দেহ নেই, তাঁর উচ্চারণ-বিশিষ্টতার প্রসঙ্গকে সেইজন্য ছোট করে দেখবার কোন দরকার নেই। কখনো সহজেই একথা মনে হতে পারে যে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে নজরুলের নিজস্ব রীতিই পাঠককে তাঁর কবিতার পক্ষে কোন সমস্যা হয়ে উঠতে দেয় নি।

কবিতায় পাঠকের সমস্যা দেখা দেয় কবি ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান ঠিক কতটা হবে সে-সম্পর্কে অনবধানতা থেকে। এই ব্যবধানটি নজরুল কিভাবে লক্ষ্য করেছেন তা দেখা যেতে পারে। যদৃচ্ছা কয়েকটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক:

১। বল বীর
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি আমারি, নত-শির
ওই শিখর হিমাদ্রির।

* * *

বল বীর
আমি চির-উন্নত শির।
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা — প্রলয়ের আমি নটরাজ
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
(বিদ্রোহী/অগ্নিবীণা)

২। রক্ত রুদ্র উল্লাসে মাতি রে।
ভগবান ? সেত হাতের শিকার। —
মুখে ফেনা উঠে মরে !
ভয়ে কাঁপিছে কখন পড়ি গিয়া তার
আহত বুকের প'রে
অথবা যেন রে অসহায় এক শিশুরে ঘিরিয়া
অজগর কাল-কেউটা সে কেন
ফিরিয়া ফিরিয়া
চায়, আর ঘোরে শন্ শন্ শন্,
ভয়-বিহ্বল শিশু তার মাঝে কাঁপেরে যেমন —
তেমনি করিয়া ভগবানে ঘিরে
ধূমকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে চলেছি রে ;
আর শাপে ঘেরা অসহায় শিশু সম
বিধাতা তোদের কাঁপিছে রুদ্র ঘূর্ণির মাঝে মম !
(ধূমকেতু/অগ্নিবীণা)

৩। আমি ঝড় ? ঝড় আমি ? না, না,
আমি বাদলের বায়
বন্ধু ! ঝড় নাই
কোথায় ?
(ঝড়/বিষের বাঁশী)

আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত
পীড়িতের মাখি খুন,

/ লালে লাল হ'য়ে উদিছে নবীন

প্রভাতের নবারুণ !

আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট

ভাঙিয়া দাও।

রং-করা ঐ চামড়ার মত আবরণ

খুলে নাও !

(কুলি-মজুর/সাম্যবাদী)

৫। প্রার্থনা ক'রো - যারা কেড়ে খায়

তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস

যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায়

তাদের সর্বনাশ !

(আমার কৈফিয়ৎ/সর্বহারা)

৬। অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চল্ রে চল্ রে চল্

চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত,

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

আমরা টুটাব তিমির রাত

বাধার বিন্ধ্যাচল।

(চল্ চল্ চল্/সন্ধ্যা)

৭। ঊর্দ্ধ হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের

শিখা অনির্বাণ।

(প্রলয়শিখা/প্রলয়শিখা)

প্রথম উদাহরণের উচ্চারণরীতির বৈশিষ্টতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি আরেকবার বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে এই অংশে কবির আত্মশক্তির উদ্বোধনই মুখ্য হওয়া সত্ত্বেও পাঠকদের মধ্যেও তিনি আত্মশক্তি সম্পর্কে বোধ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। বস্তুত, প্রত্যেকের মধ্যেই যে অমিতশক্তির সঞ্চয় আছে, এই বোধের অংশ তিনি পাঠকদের দিয়েছেন পাঠককে কবিতার অংশীভূত করে নিয়ে। পাঠকদের কবিতার অভ্যন্তরে সংস্থান করে দেওয়ার আরেকটি উদাহরণ দুই সংখ্যক দৃষ্টান্ত। 'বিধাতা তোদের কাঁপিছে' বলে কবি পাঠককে কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। এখানে 'তোদের'—এই ইতরবাচক প্রয়োগে

পাঠকদের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ না পেয়ে বরং বিধাতার প্রতি তাচ্ছিল্যই দেখানো হয়েছে। তিন সংখ্যক দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে, কবি নিজের সম্পর্কে এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁর বাসনা ও তাঁর পরিচয়ের মধ্যে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলেই এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে বেদনাপ্রসূ। এই মনোভাবের উচ্চারণে প্রথম পংক্তির স্থিতি, এবং এখানেই কবির পক্ষে থেমে পড়া বোধহয় শোভন হতো, কিন্তু তিনি তারপরও দুটি ভাঙা পংক্তিতে তাঁর ধরা গলার স্বর উপহার দিয়েছেন। 'বন্ধু ! ঝড় নাই/কোথায় ?'—এই অংশে পাঠককে তাঁর ভগ্নবুকের ভিতর লোকটি উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন ; অর্থাৎ, কবির আত্মকথনই যথেষ্ট নয়, তাঁর ভগ্নবুক পাঠক দর্পণে সমর্পিত হয়ে আরো প্রত্যয়িত হয়েছে। এখানেও, অতি কারুনিপুণ উচ্চারণে পাঠক কবিতার অভিব্যক্তির সংলগ্ন হয়ে গেছে। চতুর্থ সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবি সোজাসুজি পাঠকদের দীক্ষা দিচ্ছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকপট ভাষায়, অনুজ্ঞা ধরণের উক্তির মাধ্যমে। এখানে পাঠকই উদ্দিষ্ট, ফলে কবি ও পাঠকের মধ্যে একটি সবল ব্যবধান লক্ষণীয়। পাঠক কাব্যদেহে উদ্দিষ্ট হিসাবে গৃহীত এবং এই গ্রহণ প্রধানত বহিরঙ্গ, ফলে উচ্চারণের একটি ভঙ্গিমাত্র রূপেই তা গ্রাহ্য। কবি-পাঠক ব্যবধানটি এখানে অতি-নিরূপিত বলে হয়তো উৎকর্ষের দিক থেকে হানিকরও। কিন্তু পঞ্চম দৃষ্টান্তে কবি আর চতুর্থ দৃষ্টান্তের মত দীক্ষাগুরু নন, এখানে পাঠকের কাছে তাঁর 'প্রার্থনা' আছে। কবি-বাসনার কৃতার্থতার জন্য পাঠকের সহকামনা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। এখানেও পাঠক ও কবির ব্যবধানটি সূচিত, তবে কবির কর্মযজ্ঞে পাঠকদের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়ার দরুণ, কবি বাসনার সমষ্টি-বাসনায় রূপায়ণের মাধ্যমে তিনি পাঠকদের ভূমিকাকে বহিরঙ্গ থেকে অনেকখানি মুক্ত করতে পেরেছেন। ছয় সংখ্যক দৃষ্টান্তে আপাতদৃষ্টিতে সম্বোধিত 'তরুণ দল'-এর সঙ্গে দ্বিতীয় স্তবকে কবির অবিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসলে কবিতাটি একটি গান, কবিও কবিতা-পাঠের বা গানের নির্দেশ দিয়েছেন : 'কোরাস'। এই নির্দেশটিই যথেষ্ট : সমবেতের মধ্যে কবি স্বাতন্ত্র্যের অতিসচেতন অবলুপ্তির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এখানে কবি-পাঠকের মধ্যে যে কোনও রকমের দূরত্ব বা ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে। এবং সপ্তম সংখ্যক দৃষ্টান্তেও কবির আত্ম-ঘোষণায় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-কণ্ঠ শোনা যায় না, সেখানেও বহুবচনাত্মক সর্বনাম প্রয়োগে কবি ব্যক্তিত্বের বহুর মধ্যে সম্প্রসারণই লক্ষণীয়। পাঠক ও কবির ব্যবধানটি অতি-নিরূপিত আত্ম-সম্প্রসারণের মাধ্যমে কবি এখানে প্রায় পুরোপুরি মুছে ফেলতে পেরেছেন।

এই পর্যালোচনা থেকে সম্বোধিত তথা পাঠক ও কবির পরস্পরতার ব্যাপারটি

নজরুল কিভাবে তাঁর কবিতায় নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন, তার একটি সাধারণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সর্বত্রই প্রায় দেখা যাচ্ছে কবি ও পাঠকের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তিনি তার লোপ ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছেন। উভয়ের মধ্যে এই দূরত্বটির পরিমাপ ঠিক কি এবং তার নিষ্পত্তি কিভাবে ঠিক সম্ভব, তার কোন বিধিনির্দেশই নেই: তবে কবিতার ইতিহাসে এইরকম অভিজ্ঞতার অভাব নেই যেখানে ব্যবধানের অস্বীকার বা ব্যবধানের সম্প্রসারণ কবিতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে দুই-ই চ ম রীতি: কবি ও পাঠকের পরস্পরতাব সমস্যা এই রকম ক্ষেত্রগুলির অস্তিত্ব আছে বলেই কখনো কখনো গুরুতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা এখানে নজরুলের কবিতার সমালোচনায় আগ্রহী নই, তাঁর পাঠক-কবি পরস্পরতার নিষ্পত্তি-রীতি ভ্রমাত্মক কি না, সেই রকম কোন বিতর্কেও প্রবেশ কবতে চাই না, নজরুলের কবিতার সাধারণ পরিচয় গ্রহণেই বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ। তথাপি একটি কথা এখানে সম্ভবত বলা যেতে পারে: কবি ও পাঠকের ব্যবধান নিষ্পত্তির যে রীতি নজরুল গ্রহণ করেচেন, তা তাঁর কাব্যভূমিকার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। নজরুলের কবিতার যে অধিষ্ঠান বাংলা কাব্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এই রীতিটি তাঁর পক্ষে বিশেষ জরুরী ছিল বলে মনে হয়, এবং তার ব্যবহারকে কবিতায় তিনি যে সহজেই তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পেরেছেন, তাতেও কোন সন্দহে থাকে না।

এই তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা উন্মুখ হয়ে উঠি যখন সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের প্রাসঙ্গিক আলোকে বিষয়টিকে আমরা লক্ষ্য করি। নাটকে, গল্প, উপন্যাসে বা আখ্যানমূলক কবিতায় সম্বোধনের প্রত্যক্ষরীতি যদিও স্বাভাবিকতায় গৃহীত, গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরণের প্রত্যক্ষ সম্বোধনকে কোন অনিবার্য নির্দিষ্টতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি দেখা যেতে পারে:

১। শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে
শস্যশালিনী করিব।
(সত্যানন্দের উক্তি: আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ)

২। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ?
(বাসবের উক্তি: মেঘনাদবধ কাব্য/দ্বিতীয় সর্গ)

উদ্ধৃতাংশ দুটির একটি উপন্যাস ও একটি আখ্যানমূলক কাব্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। উদ্ধৃতিতে সত্যানন্দ মহাপুরুষের উদ্দেশে উক্তি করেছেন, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেবরাজ ইন্দ্র দেবী কাত্যায়নীকে সম্বোধন করেছেন। সম্বোধনের এই প্রত্যক্ষরীতি উপন্যাস ব আখ্যানমূলক কাব্যে গ্রাহ্য, এখানে এক চরিত্র অপর চরিত্রকে সম্বোধন করে থাকেন। কিন্তু গীতিকবিতায়ঃ

১। প্রদীপখানি নিবে যাবে
মিথ্যা কেন জ্বাল?
(ম্রিয়মানা/ক্ষণিকা)

২। গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে
আমার আত্মা লালিত ঃ
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
(অন্ধকার/বনলতা সেন)

এই রকম সম্বোধন যখন প্রায় প্রত্যক্ষরূপেই উপস্থিত, তখন কি কবি কোন ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করেছেন বলে খুব অভ্রান্তভাবে বলা যায়? এখানে বক্তা কিংবা উদ্দিষ্ট কেউই তথাকথিত অর্থে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিচরিত্র নয়। তবু যে গীতি-কবিতায় এ ধরণের উচ্চারণ প্রায়ই শোনা যায়, তার কারণঃ গীতিকবিতায় এই পদ্ধতি প্রকরণমাত্র রূপে সচরাচর গৃহীত হয়, এই রকম উচ্চারণ গীতিকবিতার মন্ময় নৈর্ব্যক্তিকতা সহজেই উপহার দিয়ে থাকে। সাধারণভাবে অবশ্যই মনে হতে পারে যে, এখানে কবি পাঠককে সম্বোধন করেছেন। নজরুলের নির্বাচিত অংশবিশেষ আমরা এইভাবেই লক্ষ্য করতে চেয়েছি, কিন্তু গীতিকবিতার বা মন্ময় শিল্পের বিশ্বমুখীনতার কথা মনে রাখলে এইভাবে বিপদগ্রস্ত হতে হয় না। আর, তখন কারর এই মুহূর্তের উক্তির মধ্যে যে তাঁর তাৎক্ষণিক ভাব-ভাবনাই প্রকাশিত মাত্র, এই রকম প্রমাদও সহজে এড়ানো চলে। সুসেন ল্যাঙ্গারও মোটামুটি এই রকম দৃষ্টিতেই গীতিকবিতার সম্বোধনের ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করেছেন, এবং বলা বাহুল্য, তাঁর বিশ্লেষণ ভঙ্গিটি মনোজ্ঞ।

তথাপি নজরুল সম্পর্কে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতটি যে কিছু আলাদা, আমাদের তা মনে রাখা দরকার। এমন কি 'গীতিকবিতার প্রকরণ' কথাটিকে খুব নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করলেও এই কথাটিও মেনে নিতে হয় যে, সব কবির কবিতায় সমান অনুশাসন চলে না, এমন কি, একই কবির কবিতাও পর্যায়ভেদে শাসনভেদ দাবি করে। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণই গ্রহণ করা যাক:

১। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
(১নং/গীতাঞ্জলি)

২। রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান,
(৩৭নং/বলাকা)

৩। দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
(১১নং/ স্বদেশ বিষয়ক/গীতবিতান-১)

৪। খনে খনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তনিশীথ করিস যাপনা —
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার।
(১২নং/ঐ/ঐ)

এখানে প্রথম সংখ্যক উদ্ধৃতির সম্বোধিত অতি-নির্দিষ্ট : কবির 'প্রভু' প্রায় একটি চরিত্রের মতোই উপস্থিত। কিন্তু অপর তিনটি উদ্ধৃতির সম্বোধন বোধহয় কোন নির্দিষ্টের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়; অন্যথায় বলা যেতে পারে, এখানে পাঠকই সাধারণ লক্ষ্য। অথবা এই তিনটি ক্ষেত্রে কবি নিজেকেই সম্বোধন করছেন। মনে হয়, এক সঙ্গে দুই-ই। কবি ও পাঠকের ব্যবধানহীন এক অভিন্নভূমিতে সহাবস্থানের এগুলি অতি সুন্দর কাব্যদৃষ্টান্ত। এখানে কবিকণ্ঠ বা ব্যক্তিকণ্ঠ এবং সমষ্টিকণ্ঠ সংলগ্ন ও পরস্পর। এবং এই রকম স্থলে যে কবিতায় ব্যক্তির মুক্তি ঘটে যায়, এটাও সাধারণ অভিজ্ঞতা। একে গীতিকবিতার তথাকথিত 'মন্ময় নৈর্ব্যক্তিকতা' বলা সম্ভবত উচিত হবে না। তবে এইভাবেই দেখা যাবে যে সম্বোধনরীতি ক্ষেত্রভেদে স্বতন্ত্র মনোযোগ ও বিবেচনা দাবি করে। কখনো কখনো তা কবিতার প্রকরণগত উপাদানমাত্র হয়েও যে পাঠকের প্রতি উদ্দিষ্ট হতে পারে, তার দৃষ্টান্তও খুব কম নয়।

কিন্তু এই রীতির স্পর্শে নজরুলের কবিতা যে উচ্চারণের দিক থেকে কখনো কখনো খুব বিশিষ্ট বলে মনে হয়, বা তাঁর কণ্ঠস্বর খুব স্বাধীন শোনায়, তার প্রধান কারণ সম্ভবত ব্যক্তিকে সমষ্টি অর্থে নৈর্ব্যক্তিতে সমর্পণ। এ এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিকরণ সন্দেহ নেই এবং এর পশ্চাদভূমিতে জরুরি কালচৈতন্য খুব প্রখরভাবে উপস্থিত।

আর, কালবিদ্ধ জীবনে সমষ্টিগত উপযোগিতার ভিত্তটি সম্পর্কে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। এই নিশ্চয়তা কবিতার পক্ষে কতখানি হানিকর, সেটা আলাদা প্রসঙ্গ, কিন্তু এই রকম ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ঋজু ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, সময় সময় তারস্বর ঘোষণার মতও শোনায় হয়তো, তবু কবির অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সততা সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলে না। এবং একথা তো খুবই সত্যি যে, এই উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি-তাৎপর্যেই যে কোনও শিল্পের অধিষ্ঠান। উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার অংশটিকে যদি বিষয়ের দিক বলা যায়, তাহলে তার স্মৃতি-ধারণকে শিল্প-রচনার অংশ বলে উল্লেখ করা চলে। এই শিল্প-রচনার অংশই বস্তুত অভিব্যক্তির অংশ : বক্তব্য কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তা অভিব্যক্ত হচ্ছে। এই অভিব্যক্তির কৃতার্থতাই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা সাধ্য। কাজেই অভিব্যক্তির ধারাই প্রধানভাবে লক্ষণীয়।

৫

নজরুলের কবিতার অভিব্যক্তির বিশিষ্টতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা তাঁর সম্বোধন-রীতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। সম্বোধনের প্রত্যক্ষতার কথা যখন উল্লেখ করা হয়, তখন তার অনুগামী প্রসঙ্গ হিসাবে তাঁর ভাষারীতির কথা জরুরী হয়ে ওঠে। সম্বোধন প্রত্যক্ষ হওয়া অর্থ, ভাষারীতিতে কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী অনুসরণ। কথ্যরীতিকে ব্যাকরণের সংজ্ঞায় সমর্থন করা যায় হয়তো, কিন্তু এর ব্যাখ্যা প্রধানত লক্ষণ-মাত্রিক। কতকগুলি লক্ষণ মিলিয়েই অংশত তার ব্যাখ্যা করা চলে।

কথ্যরীতিতে সবচেয়ে প্রথম লক্ষণীয় সম্ভবত তার গদ্যানুষঙ্গ, এবং প্রবহমানতা। মানুষ কথা বলে গদ্যে, কাজেই কবিতায় যদি মানুষের কথা বলার রীতিকে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে গদ্যধর্মের অনুশীলন এক অপরিহার্য শর্ত হয়ে ওঠে : অর্থাৎ আঙ্গিক যেখানে মূলত পদ্য, সেখানেও গদ্যের অংশভাগ স্থির করে নিতে হয়। গদ্য-পদ্যের সহাবস্থানেই প্রকৃতপক্ষে কবিতায় কথ্যরীতির প্রাণস্ফূর্তি সম্ভব। গদ্যভাষা সচরাচর প্রত্যক্ষ, কাব্যভাষা তির্যক। এই প্রত্যক্ষতার ভাষা উপকরণ যে শব্দ, গদ্যে তা অর্থ-নির্দিষ্ট কবিতায় অর্থ-অতিক্রমী। কবিতায় কথ্য ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে নজরুলের কোন সচেতন মনোযোগ ছিল, অথবা ঐভাবে তিনি কবিতার উচ্চারণ-সমস্যা নিয়ে চিন্তাশীল ছিলেন, এই রকম কোন সমর্থনমূলক তথ্য আমাদের কাছে উপস্থিত নেই। তথাপি গদ্যভাষার মধ্যে যে প্রয়োজন-

সাপেক্ষতা আছে, নজরুলের উচ্চারণের পক্ষে এই সূত্রটি বিশেষ উপযোগী ছিল বলেই হয়তো, তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ, প্রয়োজনীয়, অর্থবদ্ধ উক্তির এতখানি সমারোহ লক্ষ্য করা যায়।

১। জাগে রে জোয়ান! বাত ধরে গেল
মিথ্যার তাঁত বুনি! (সব্যসাচী/ফণিমনসা)

২। জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে
মহাজন কয়, (ফরিয়াদ/সর্বহারা)

৩। অগ্র-পথিক হে সেনাদল,
জোর কদম্ চল্ রে চল্! (অগ্রপথিক/জিঞ্জীর)

৪। হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
নব চেতনায় জাগো, জাগো, ওঠ বীর! (বিংশ শতাব্দী/প্রলয়শিখা)

উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে অত্যন্ত নগ্ন প্রত্যক্ষতা আছে, যা অর্থ, ঠিক তাই অর্থ, যা অর্থ, তা এই মুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গদ্যধর্মী এই রকম উক্তিমাত্র অনেক উদাহরণ নজরুলের কবিতায় খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এবং এইভাবে গদ্যের প্রয়োজন-সাপেক্ষতা গুণটি নজরুল তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তবে পাশাপাশি একথাও খুব স্পষ্ট যে গদ্যানুষঙ্গ কথ্যরীতির একটি প্রধান গুণ হলেও, কবিতায় তার ব্যবহার যে শিল্প তাৎপর্যের তাগিদে, নজরুলের কবিতার বর্তমান লক্ষণে তা কোনদিক থেকেই বিশেষ সমর্থিত হয় না। কবিতায় গদ্যভাবনা কোন বিচ্ছিন্ন একটা প্রকরণ নয়, গদ্য ও পদ্যের মধ্যে প্রচলিত বিরোধ ধারণার নিষ্পত্তিই প্রধান বাসনা: গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধে সাধনই বস্তুত প্রধান শিল্প ভাবনা। নজরুলের কবিতায় এই রকম সচেতনতা যে প্রায় অনুপস্থিত, সে কথা মেনে নিলেও কিন্তু কবিকে কোন রকমেই ছোট করা হয় না। নজরুল তাঁর কবিতায় বাকরীতি যে অনেকক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, এই তথ্যটি তো অবশ্যই থাকে। গদ্যের প্রয়োজন-সাপেক্ষতা গুণটি আত্মসাৎ করেই তিনি এই কাজটি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়।

আবার বাক্‌রীতি এক অর্থে বাক্‌ভঙ্গিমাও বটে, নজরুল যে কথোপকথনের এই অতি স্বাভাবিক রীতি বা ভঙ্গিটিকে খুব অবলীলাক্রমে তাঁর কবিতায় প্রয়োগ করতে পেরেছেন, এই দৃষ্টান্তও যথেষ্ট উপস্থিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত অবলম্বনে বিষয়টি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

১। মসজিদে কাল শিরণী আছিল,—অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব
হেসে তাই কুটি কুটি, (মানুষ/সাম্যবাদী)

২। মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত
ধ্যানী মুনি ঋষি যোগী— (পাপ/সাম্যবাদী)

৩। (তোরা) চিনলিনে তা চিনির
বলদ, সার হল তাই শাক বওয়া। (জাতের বজ্জাতি/বিষের বাঁশী)

৪। বন্ধু! তোমরা দিলেনাক দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন মান! (আমার কৈফিয়ৎ/সর্বহারা)

কথোপকথনে সচরাচর যে ভঙ্গি আমরা ব্যবহার করি, তার অনেকখানিই কবি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন, এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে তার সেই প্রয়াস আমাদের গোচরে আসে। প্রথম দৃষ্টান্তে 'হেসে…কুটি কুটি' এই শব্দবন্ধ ব্যবহারে যতটা না বাক্‌রীতির স্পর্শ, তার চেয়ে বেশি 'মোল্লা সাহেব' শব্দবন্ধ ব্যবহারের মধ্যে তার গুণটি ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। এমনি, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, 'ছেড়ে দাও' শব্দবন্ধে বাক্‌রীতি-নির্ভর উপাদান নিশ্চিতরূপে প্রয়োগ করে কবি যে অনেকখানি লাভবান হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'চিনির বলদ' প্রবচন ব্যবহার করে কথ্যভঙ্গির নিকটবর্তিতা যতটা সাধ্য হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষণীয় তাৎপর্যে 'সার হল' শব্দবন্ধের প্রয়োগ করা হয়েছে। এই শব্দবন্ধটি কথ্যধ্বনির পক্ষে এখানে বিশেষ অনুকূল হয়েছে। চতুর্থ দৃষ্টান্তে 'রাজ-সরকার রেখেছেন মান' লিখে বাকপ্রতিমার ব্যবহার-জনিত উৎকর্ষেই যে তিনি উক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা নয়, বরং 'রেখেছেন' ক্রিয়াপদে তিনি যে সম্মানিত প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন, তাতেই উক্তি যথার্থ সিদ্ধ হয়েছে। অবশ্য একথা মনে হওয়াও খুব স্বাভাবিক যে 'মান রেখেছেন' বললে বাক্‌ধ্বনির প্রতিশ্রুতি অনেক বেশি ফলবান হতে পারত। নজরুলের কাব্য-পংক্তিতে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে অনেক সময়েই এই রকম স্থান বিপর্যয় দেখা যায়, একে সুবিধাবাদী বিপর্যয়সাধন বললেও ক্ষতি হয় না; এবং এই সব ক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত কাব্যপ্রকরণ দ্বারাই অধিক অনুশাসিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। নজরুলের ধ্বনিশ্রুতি খুব নির্দিষ্টভাবে বাক্‌ধ্বনির অনুসরণ করে গড়ে উঠে নি সম্ভবত, কিন্তু তাঁর কবি-ভূমিকাটি এমন স্বতন্ত্র যে, (সম্বোধনের প্রত্যক্ষতা তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হওয়ার দরুণ),

কথ্যরীতি তাঁর কবিতার উচ্চারণের পক্ষে প্রায় একটা শর্তের মত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নজরুল যে এই শর্ত সম্পর্কে সচেতন ও মনোযোগী ছিলেন, একথা হয়তো সব সময় বলা যাবে না, কিন্তু এ-ও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই: তাঁর এই স্বতন্ত্র কবি-ভূমিকা, খুব স্বাভাবিক বলেই হয়তো, কণ্ঠস্বরে কথ্যরীতির অগঠিত স্পন্দন সঞ্চারিত করে দিয়েছে।

কাব্যের প্রথানুগ উচ্চারণের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও অনেক সময় অতর্কিত চমকে কথানুগততা সঞ্চারিত হয়ে যায়। নজরুলের কবিতায় এই রকমের উদাহরণ অজস্র এবং সাধারণভাবে সুখকর। 'বিদ্রোহী' (অগ্নিবীণা) কবিতায়, 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি' পংক্তিতে 'ফাড়ি' শব্দের প্রয়োগ এইদিক থেকে লক্ষণীয়! এখানে শব্দ ব্যবহারে ভারসাম্যের কথাও যদি তোলা হয়, ঐ কবিতারই অন্য অংশ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল কৃতিত্বের পরিচয় নিয়ে উপস্থিত থাকে: 'আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,/আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম,/আমি ধন্যি।' এই অংশে শব্দের ধ্বনিগত ভারসাম্য সম্পর্কে বোধহয় কোন প্রশ্ন উঠবে না, আর 'আমি ধন্যি' যে কথ্যরীতির প্রসাদ লক্ষণাক্রান্ত, তা খুবই স্পষ্ট। এই রকম, 'মানুষ' (সাম্যবাদী) কবিতায়, স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,/দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই!'—অংশে 'রাজা-টাজা' শুধু লৌকিক শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়, ঐ ব্যবহারে যে তির্যক আছে, কথ্যরীতির সংলগ্নতা তাতেই সাধ্য হয়েছে। একই দৃষ্টিকোণ থেকে 'পাপ' (সাম্যবাদী) কবিতায়: 'এ পাপ-মুলুকে পাপ করে নি ক' কে আছে পুরুষ-নারী?'—পংক্তিতে "পাপ-মুলুক' 'বারাঙ্গনা' (সাম্যবাদী) কবিতায়: 'সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত'—পংক্তিতে প্রথাসিদ্ধ কাব্যোচ্চারণের মধ্যে 'সেরেফ'; 'অগ্রপথিক' (জিঞ্জীর) কবিতায়: 'লঙ্ঘিব খাড়া পর্বতচূড়া অনিমেষে'—পংক্তিতে 'খাড়া'; 'জাতের বজ্জাতি' (বিষের বাঁশী) কবিতায়: 'এখন দেখিস ভারত-জোড়া/পচে আছিস বাসি মড়া'—অংশে—'বাসি মড়া' 'ঝড়' (বিষের বাঁশী) কবিতায়: 'লোকে লোকে পড়ে যায় প্রলয়ের ত্রস্ত কানাকানি!'–পংক্তিতে 'পড়ে যায়' প্রভৃতি প্রয়োগ লক্ষ্য করলে স্বভাবতই মনে হবে যে নজরুল অবলীলাক্রমে কবিতায় কথ্যশ্রুতির অধিষ্ঠান ঘটাতে পেরেছেন। তবে নজরুলের উচ্চারণে এই রকম অভিজ্ঞতা অপরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও প্রধানত লক্ষণ হিসাবেই তা লক্ষণীয়, যে সচেতন মনস্কতা এই লক্ষণকে কবিতার চারিত্র্যে উত্তীর্ণ করতে পারে, তার অভাবও তাঁর কবিতায় কম নয়। আমাদের কাছে এইটেই বড় কথা যে, নজরুলের উচ্চারণে কথ্যরীতির লক্ষণ প্রায়ই উপস্থিত,

এবং তা সচেতন শিল্প-মনোযোগের পরিণাম রূপে না হলেও তাঁর কবি-ভূমিকার অনিবারণীয় ভিতর-প্রেরণায় সম্ভব হয়েছে।

তথাপি কথ্যরীতির উপকরণ ব্যবহারে নজরুল যে অকৃপণ ছিলেন, এই তথ্য বাতিল হয়ে যায় না। লৌকিক শব্দ ব্যবহার ও প্রবাদ-প্রচলনাদির ব্যবহার মুখের ভাষায় যে বৈশেষিক লক্ষণ, নজরুলের কবিতায় তার অবাধ উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। 'মশা মেরে' ঐ 'গরজে কামান' (সব্যসাচী/ফণিমনসা); 'ছেলের হাতের নয় ত মোয়া' (জাতের বজ্জাতি/বিষের বাঁশী); 'খোদার উপর খোদকারী' (সত্যমন্ত্র/বিষের বাঁশী), 'নানান মুনির নানান মত' (ঐ); 'দিয়ে হাত মাথায়' (চাষার গান/প্রলয় শিখা), 'মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ' (ঐ), 'হাটে ভাঙি হাঁড়ি' (আমার কৈফিয়ৎ/সর্বহারা) ইত্যাদি বাংলায় প্রচলিত বিশিষ্টার্থক বাগধারা ব্যবহার করে নজরুল কাব্যভাষা কতখানি মুখের ভাষার সংলগ্ন হতে পারে, তার পরিচয় নিরূপণ করে দিয়েছেন। তবে কবিতায় গ্রহণ করবার সময় তিনি যে অবিকৃতভাবে এগুলি সব সময় গ্রহণ করেন নি, উদ্ধৃতাংশগুলি থেকেই তা সুস্পষ্ট। শিল্পীর স্বাধীনতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকারের কথা যখন সাধারণভাবে স্বীকৃত, তখনও কবির সাধিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে কাব্যপ্রথানুরক্তিই অধিক প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। 'মশা মেরে' ঐ গরজে কামান' যখন কবি লেখেন, তখন 'গর্জে' লিখলেও ছন্দের দিক থেকে কোন ভুল হতো না, তথাপি স্বরভক্তির প্রতি তাঁর ভক্তি এখানেও যথেষ্ট প্রকট, এবং প্রয়োজনবোধ দ্বারা অনুশাসিত বলেও মনে করবার কারণ নেই! বস্তুত, স্বরভক্তিজাত শব্দের প্রতি নজরুলের কাব্যসমর্থন অনেক সময় অসহায় ও প্রতিকারহীন বলে মনে হয়। কবিতার ভাষাকে স্বরভক্তিজাত শব্দ এক ধরণের নমনীয়তা দান করে, এই ধরণের শব্দ যেহেতু উচ্চারণের অনায়াস প্রতিষ্ঠার কারণেই সিদ্ধ, সেই জন্য এতে লোকমুখের বিশিষ্ট এক প্রবণতাই অবশ্য ধরা পড়ে। তথাপি কবিতার ভাষায় নমনীয়তা সঞ্চার করার আগ্রহে বাংলা কবিতার ভাষায় এই সব শব্দের ব্যবহারের একটি প্রথা যে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। নজরুল স্বরভক্তিজাত শব্দ প্রয়োগে শব্দের প্রকৃতি খুব সচেতনভাবে অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয় না; প্রয়োজনে ও নিষ্প্রয়োজনে এই রকম শব্দের প্রতি তাঁর ঝোঁকটা প্রায়ই খুব বেশি, এবং এ কথা মনে করলে সম্ভবত ভুল হবে না যে এই রকম শব্দকে তিনি কবিতার শব্দ বলে অসহায়ভাবে নিরূপণ করেছিলেন। তা ছাড়া, শব্দের বিকৃতি ঘটানোর চেয়ে শব্দের স্থান-বিপর্যয় সাধনের ফলে তিনি প্রায়ই বাগ্‌ধারা ব্যবহারের পরিপূর্ণ ফললাভে বঞ্চিত হয়েছেন বলে মনে হয়।

'ছেলের হাতের নয়তো মোয়া', 'দিয়ে হাত মাথায়', বা 'মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ',—এই দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করলেই শব্দের যথাযথ স্থান কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, তা বোঝা যায়। আর এই বিপর্যয় যে কবি কবিতার উচ্চারণ-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথাগত বদ্ধমূল ধারণার বশেই করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। নজরুলের কবিতা সম্পর্কে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা: তিনি কথ্যরীতি-সম্মত বহুতর উপকরণ তাঁর কবিতার ভাষায় সংশ্লিষ্ট করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ কবিতার প্রথাগত অভিব্যক্তির ধারা সম্পর্কে তাঁর কোন সংশয় ছিল না, বরং তাতে তাঁর বিশ্বাস ও সমর্থন সমর্পিত হয়েছিল। ফলে এক ধরণের বি-সম তাঁর কবিতার উচ্চারণে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, কবিতার উচ্চারণপদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অভাব ছিল বলেই সম্ভবত, নজরুলের কবিতার ভাষা-উপকরণে যথেষ্ট পরিমাণ আধুনিক মনোযোগের সূত্র নিবিষ্ট থাকলেও, তা বাংলা কাব্যভাষাচিন্তায় কখনোই গুরুতর প্রসঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। কথ্যরীতির উপকরণ যে তাঁর কবিতার ভাষায় অবিরল, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে তাব কবিতায় মুখের ভাষা ব্যবহারের প্রাচুর্যে। লৌকিক শব্দ বা শব্দবন্ধ তিনি এমন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করে গেছেন যে কখনো কখনো সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। 'গালি পাড়িল', 'খোয়াসনে মান', 'খোদ্ সহায়', 'বুক ঠুকে', 'ধানাই পানাই', 'বাজার সেপাই', 'থুয়ে', 'নাঙ্গা পা', 'ভুখা ফাকা', 'গো-ভাগাড়ে', 'ভড়ং', 'ট্রেডমার্কা', 'থুথু', 'দুধের বাচ্ছা', 'বাবু সাব', 'জামধরা', 'গামবড়া', 'জাত মেরে', 'ভাত মেরে', 'হাফ্-নেতা', 'পস্তাবি', ইত্যাদি কতকগুলি নির্বিচারে গৃহীত উদাহরণের প্রতি এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই সব লৌকিক শব্দ বা মুখের শব্দ যে নজরুলের কবিতায় আমরা প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখছি, তা অবশ্যই নয়: নজরুলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রবীন্দ্রানুসারী কবি বলে চিহ্নিত কবি পর্যায়ের মধ্যেও এই রকম ব্যবহারের প্রতি কিছু কিছু অনুরাগ দেখা গেছে। নিজেদের রোমান্টিক কবি-লক্ষণ সম্পর্কে এইসব কবিদের আত্মজ্ঞান প্রবক্তা ওয়াডস্-ওয়ার্থের সনদের প্রতি হয়তো তাদের মনস্ক করে থাকবে, কিন্তু সর্বত্রই ভাষাবিচারে এইসব শব্দের প্রযুক্তি ভারসাম্য রক্ষার দিক থেকে যথাযথ হয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। এমন কি, দূর উনবিংশ শতাব্দীতে বিহারীলালের কাব্য ভাষায় লৌকিক শব্দের ব্যবহার যে অনেক সময় বিরক্তিকর হয়েছিল, তার দৃষ্টান্তও আছে। বস্তুত, বাংলায় তৎসম, তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দের সহাবস্থান ঠিক কিভাবে শ্রুতি বা ধ্বনির গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তার কোন নির্ধারিত ব্যাকরণ নেই; এই রকম

বিচারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি সম্ভবত শ্রুতি। বলা বাহুল্য, বাঙালী কবিদের একটা বড় অংশ এই ক্ষেত্রে অনেক সময়েই অকৃতার্থ। এই সাক্ষ্য অবশ্যই নজরুলকে কোনভাবে উপকৃত করে নি; কিন্তু তাঁর কবি-ভূমিকাটি এমনই বিশিষ্ট যে এইসব শব্দ ব্যবহার এক ধরণের অনিবার্যতায় তাঁর কবিতায় অধিষ্ঠান পেয়েছে। যে শব্দগুলি আমরা উদ্ধার করেছি, তার মধ্যে দুটি লক্ষণ অন্তত স্পষ্ট: এক, লোক-লক্ষণ, দুই, তির্যক-লক্ষণ। এইসব শব্দের মধ্যে অনেকগুলি কোন লোক-কবিতায় বা লোক-সঙ্গীতে শুনলে সঙ্গতি খুঁজে পেতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না, আবার এইসব শব্দই ব্যবহারের বিশিষ্টতায় শাণিত তির্যক সৃষ্টি করতে সক্ষম। নজরুলের কণ্ঠস্বরে লোক-কবিতার অপরোক্ষ ভঙ্গিটি অলক্ষ্যে থাকে না; আবার অপ্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের ঈপ্সিত ফললাভে তির্যক যে অভ্রান্ত প্রকরণ, তা তিনি স্বভাবতই বুঝতে পেরেছিলেন। বাক্-রীতিতে তির্যক যে এক অতি বিশিষ্ট ভঙ্গি, অতঃপর তা-ও আমাদের অজানা নয়। তবু নজরুল যে এই রকম মনোভাব থেকে লৌকিক শব্দের তির্যক ব্যবহারে প্রযত্ন করেছিলেন, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাণিত আঘাত ও অমোঘ ফললাভ তাঁর অব্যবাহিত বাসনা ছিল। তথাপি এইসব শব্দগুলি যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন, তা তার কবিতায় শব্দ ব্যবহারে ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নকে গুরুতর করে তোলে নি, পক্ষান্তরে কথ্যধ্বনির সম্ভাবই অংশত প্রতিশ্রুত করতে পেরেছে। এবং এই সবই তাঁর স্বতন্ত্র কবি-ভূমিকার অনিবারণীয় বেগে সঞ্চারিত বলে মনে হয়।

আমরা যে ভাষায় কথা বলি, তার ছন্দ বলে যদি কিছু সনাক্ত করতে হয়, তবে প্রথমেই সম্ভবতঃ তার প্রবহমানতার কথা উল্লেখ করা উচিত। মধুসূদন দত্তে বাংলা কবিতার মুক্তি ঘটেছিল এই প্রবহমানতার অঙ্গীকরণে। অতঃপর বাংলা কবিতায় প্রবহমানতা প্রায় এক সিদ্ধ প্রকরণের মত ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থকে যে শ্বাস-ক্ষমতার আয়তনের মধ্যেই প্রতীত হতে হবে, এই রকম পূর্ব-সংস্কার বর্জনের মধ্য দিয়েই প্রবহমানতার ধারাটি বাংলা কবিতায় অববাহিত হতে শুরু করে। এই রকম সংস্কারের পেছনে কথ্যভাষার রীতিকে আত্মস্থ করবার অতি অকপট আগ্রহই সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে বলে আমরা জানি। তবে মধুসূদন কতটা এইরকম মনোযোগ দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছিলেন, অবশ্যই সে-কথা তোলা যেতে পারে। কিন্তু কোন কবির নিজস্ব ব্যবহার ক্ষমতা-অক্ষমতার ওপর বিষয়ের প্রকৃতিগত সত্য বাতিল হয়ে যায় না। বস্তুত, এই প্রবহমানতা ব্যাপারটি বাংলা কবিতায় এক ধরণের কাব্য-প্রকরণ হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, মূল

উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্দেশ্যহীন অনর্গলতায় শিথিলতা, অতিকথন ও আবেগের অতিরেকে সমর্পিত হয়ে এই রীতি অনেকাংশে কাব্য-প্রথামাত্রে পর্যবসিত। হয়তো এই বিষয়ে এমন কি রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বও খানিকটা ছিল। অথচ কথ্যরীতির ছন্দসিদ্ধিই তো প্রবহমানতা বিষয়ে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। নজরুলের কবিতায় প্রবহমানতার পরিচয় পেতে সাধারণভাবে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু তিনি সম্ভবত বিষয়টিকে প্রকৃতি-সত্য তথা শিল্পের দিক থেকে বিশেষভাবে বিবেচনা করেও দেখেন নি। তাঁর কবিতায় প্রবহমানতার বেগ সঞ্চারিত করবার চেষ্টা আছে প্রধানত দুই ভাবেঃ এক, সংলাপ রচনার সূত্রে; দুই, পংক্তির পর্বযোজনায় হ্রাস-বৃদ্ধিঘটিত কম্পন সৃষ্টির সূত্রে।

তাঁর কবিতায় পংক্তি যোজনা তথা পংক্তির পর্বযোজনার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত এক ধরণের মুক্তি সচরাচর লক্ষ্য করা যায়; অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'বিষের বাঁশী'র অন্তর্গত 'ঝড়' কবিতাটি বা 'সিন্ধুহিল্লোল'-এর অন্তর্গত 'সিন্ধু' কবিতার বিভিন্ন তরঙ্গ এই রকমের উদাহরণ হিসাবে স্মরণ্য; তথাপি একথাও সত্য যে, এই সূত্রেও তাঁর কবিতায় এমন অনর্গল ও প্রচুর নয়, যার সাক্ষ্য থেকে তার কবিতায় প্রবহমানতার পরোক্ষ সঞ্চার সম্পর্কে প্রত্যয়িত হওয়া যায়। কখনো কখনো আবার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যাকে শাদা চোখে প্রবহমান বলা হয়, যেমনঃ 'কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী/পুত্রকন্যা কামনা করিল ?' (বারাঙ্গনা/সাম্যবাদী); 'তুমি কোনদিন কারো করোনি বিচার/কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির/কূলে ব'সে কাঁদ মৌনা কন্যা ধরণীর/একাকিনী! যেন কোন্ পথ ভুলে আসা/ভিন্-গাঁর ভীরু মেয়ে।' (মা-বিরজাসুন্দরী দেবীর শ্রীচরণারবিন্দে/সর্বহারা) 'ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে ঋষি/ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি/সুখে বর-বধূ যথা— সেখানে কখন্/হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক', (দারিদ্র্য/সিন্ধুহিল্লোল): ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দৃষ্টান্তের একটা মৌলিক দিক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত হয়ে যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক প্রকার প্রত্যক্ষ সম্বোধন আছে। এবং এই তথ্যটি নজরুলের কবিতা প্রসঙ্গে বিশেষ জরুরি। প্রকৃতপক্ষে, নজরুলের কবিতায় তথাকথিত দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রবহমানতার দৃষ্টান্ত খুঁজে বার করা বিশেষ শ্রমসাধ্য; হয়তো বা তার প্রয়োজনও কম, কেন না তাঁর কবিতার ধ্বনিতে প্রবহমানতার বেগটি যেন অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়ে আছে, অন্তত শ্রবণে তা ধরা পড়ে। এবং একটু ধৈর্যশীল অনুসন্ধানীর কাছে অতঃপর আর গোপন থাকে না যে, তার প্রধান কারণ ঐ সম্বোধন-রীতি। ছেদ-যতি-চিহ্নপাতে কবি যে সব সময় খুব মনোযোগী

ছিলেন, এমন নয়, তবু প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও আশ্চর্যবোধক চিহ্নপাতে তিনি এত অনর্গল ছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট পংক্তির মধ্যেই তিনি পাঠককে থামিয়ে আবার চালিয়েছেন। এর ফলে পদ্যের নিশ্চিত বন্ধনদৃশ্য থেকে কবিতার ধ্বনি ও শ্রুতিকে তিনি প্রায়ই মুক্ত করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। নজরুলের কবিতায় প্রবহমানতা প্রায়ই দৃশ্যগ্রাহ্য ব্যাপার নয়, সর্বদাই তা শ্রুতিগ্রাহ্য; এবং যে কবি প্রথাগত পদ্যবন্ধে অধিক আগ্রহী, তিনিও যে অনেক সময় আর প্রায় অনায়াসে প্রবহমানতা কবিতায় সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, এটি অভিজ্ঞতা হিসাবে সুখকর। এবং নজরুলের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়েছিল অবশ্যই তাঁর স্বতন্ত্র কবি-ভূমিকার জন্যে, যেখানে তাঁর সম্বোধন-রীতিটিই সবচেয়ে গুরুতর প্রসঙ্গ।

নজরুল যখন হুগলি জেলে অনশনরত, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে এক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন অনশন ভাঙবার জন্যে অনুরোধ করে, এবং বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তাঁর প্রয়োজন কতখানি জরুরি, ঐ তারে কবির এই উপলব্ধিটুকু অনুচ্চারিত থাকে নি। একে রবীন্দ্রনাথের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বলা উচিত হবে না, বরং এক আবশ্যিক উপলব্ধিরূপেই তাঁর উদ্বেগ আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয়। বস্তুত, নজরুলের গুরুত্ব-বাংলা সাহিত্যে একটু বিশেষ ধরণের।

মানুষ বেঁচে থাকে দেশে কালে, এবং দেশ ও কালের মানুষই কবিতার বড় প্রসঙ্গ। নজরুলের কবিতার বিষয়বস্তু রূপে যদি কিছু নির্দেশ করতে হয়, তাহলেও বোধ হয় খুব সহজেই বলা যায় যে তাঁর বিষয় মানুষ: প্রেমে-অপ্রেমে, প্রসারে-সংকীর্ণতায় উপস্থিত-অস্তিত্ব বলেই যার অপর নাম জীবন। নজরুলের কবিতায় বিশুদ্ধ আত্মবীক্ষা আছে কিনা, বা থাকলেও তার পরিমাণ ও পরিভাষা কিভাবে রচিত হওয়া উচিত, তা আলাদা প্রসঙ্গ, কিন্তু তাঁর কবিতা পাঠে মানুষই যে তাঁর সর্বময় মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, সে-সম্পর্কে অন্তত কোন দ্বিধা থাকে না। আর মানুষ মানেই তো জীবন: 'বেঁচে আছি' ও 'বাঁচা' কথার মধ্যে সমর্পণ ও উদ্যমের যে তারতম্যটি নিহিত আছে, তাঁর 'জীবন'-সত্য অনুসরণে এই ভেদ-সংকেতটি স্মরণযোগ্য।

নজরুলকে বাংলা দেশ 'বিদ্রোহী-কবি' বলে চিহ্নিত করেছে। কবিতায় বিদ্রোহী ও বিপ্লব শব্দ দুটিকে তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন তো বটেই, ধূমকেতুর ফাইল ঘাঁটলেও দেখা যাবে বিদ্রোহকে তিনি প্রায় আত্মপরিচয়মূলক শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। বস্তুত, বিদ্রোহের আলোকে না দেখলে তাঁর পরিচয় ও উন্মীলন বোধহয় কখনোই যথার্থ হয় না। 'আমি চির-বিদ্রোহী বীর' বলে

তিনি আত্মঘোষণা করেছিলেন বলেই তিনি বিদ্রোহী নন, বিদ্রোহ তাঁর সচেতনা ; এবং বিদ্রোহমাত্রই যেহেতু উদ্যম সেই জন্য নজরুলের সচেতনা একটি উদ্যমশীল শক্তির মতো। বিদ্রোহের ব্যাখ্যা নজরুল এইভাবে করেছেন : "বিদ্রোহ মানে কাউকে না মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না সেটাকে মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা"। মসজিদ-মন্দিরে, যেখানে মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী,' তার অর্থ কি বোঝা যায় ? মন্দির পূজারীর না দেবতার ? 'কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক/জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব' নিয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে 'দোকানে কেন এ দর-কষাকষি ?'—এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর কি ? ঈশ্বর অনুসন্ধানে কেন শাস্ত্রবিদ্‌রাই শরণ্য ? তাঁরা কি "খোদার খোদ 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' ?" পাপই যদি ঈশ্বরের পথ, পাপী বলে এ-সংসারে কি কাউকে সনাক্ত করা যায় ? তথাকথিত বারাঙ্গনার কি থুথুই প্রাপ্য ? 'সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে' ? 'সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়'—কেন ? সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই'—কিন্তু সত্যি কি তা সম্ভব ? এইরকম অজস্র জিজ্ঞাসা। মানুষের সহজ বোধ যেখানে মেলাতে পারে না, সেইখানেই সে প্রশ্ন করে। এই প্রশ্ন অবশ্যই শিশুর চাঁদ বিষয়ক প্রশ্ন নয়। নজরুলের অনুসরণেই বলা যায়, এ শুধু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা চিহ্নের লাঞ্ছনা নয়, 'বুঝি না' কথাটাকে আত্ম-প্রতারণা করে ঘোষণা করা। অভাব-বোধের অস্পষ্ট অনুভূতি-মাত্র নয়, প্রখর বোধের অনুশাসনে উদ্ধত উচ্চারণ।

অভাববোধ কথাটি কিন্তু নজরুলের কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি প্রসঙ্গ। জীবনে সঙ্গতির অভাবে ক্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির ওপরই যেন তার চোখ সবার আগে গিয়ে পড়ে, এবং অচিরাৎ তা তাঁর ভাবনার বিষয় হয়ে যায়। আবার তাঁর ভাবনা কখনোই শান্ত ও নিষ্ক্রিয় নয়; মনে হয় সোজা মসৃণ পথে কোথাও গহ্বর বা ঢিবিগুলি যে শুধুই বাধা, এই বোধে তিনি জাগ্রত। পথ চলতি এই সব সামঞ্জস্যহীন অসঙ্গতির মুখ বড় বেশি আততায়ীর মত দেখায়, ফলে পথ হয়ে ওঠে সংকুল ও দুর্গম, আর রক্তের অভিজ্ঞতা অপ্রতিরোধ্যরূপে উপস্থিত হয়। নজরুলও রোমান্টিক কাবর স্বভাবে, রক্তাক্ত হয়েছিলেন। জীবনের কাঁটার ধার বড় বেশি, কিন্তু এ কি চিৎবিশ্বের অভিজ্ঞতামাত্র ? নজরুল তো বাইরের দিকেই তাকিয়েছিলেন, এই বহির্জগৎহীন অন্তর্জগৎ কি সাধ্য ? এই প্রশ্নের নিরসন তিনি বোধ হয় সহজ-ভাবেই করে নিতে পেরেছিলেন, এবং তথা-কথিত বাস্তবজীবনের সঙ্গতিহীনতাকেই তিনি প্রধান ও প্রথম অসুখ বলে নিরূপণ করেছিলেন ; তাঁর সমস্ত অশান্তি ও রক্তক্ষরণ ওই অসুখের আক্রমণজাত।

এই পর্যন্ত ছকে ফেলে তাঁকে অনুসরণ করা যায়; কিন্তু এরপরই বস্তুত তাঁর স্বকীয়তার আত্মপ্রকাশ। আক্রমণশায়ী আর্তি, মেলাতে না পারার জন্যে বিষাদ-বোধ, কোনটাই তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নয়, কিন্তু কখনোই প্রগাঢ়রূপে তার অধিষ্ঠান ঘটতে পারে নি। বেঁচে আছি, দুঃখে বেঁচে আছি, আর্তিতে বেঁচে আছি,—নজরুল সম্ভবত এই শোচনীয় সমর্পণে অস্তিত্বের সত্যমূল্য খুঁজে পাননি। অসুখকে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছিলেন তিনি, অসুখকে পরাভূত করে, অর্থাৎ অসুখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আক্রমণকে প্রতি আক্রমণে পরীক্ষা করে। শক্তিসাধনা ফলত তাঁর কবি-চারিত্র্য। কিন্তু এই শক্তির রূপটি তাঁর মধ্যে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, প্রসঙ্গত তাও লক্ষণীয়। তিনি কি আত্মশক্তির উদ্বোধন চেয়েছিলেন, না কি সমষ্টিশক্তির? প্রকৃতপক্ষে, আমরা যেমন দেশে কালে বাঁচি, তেমনি শুধু একা বাঁচি না, সমষ্টিগত হয়েও বাঁচি। বা, বলা যায়, একাও বাঁচি, একত্রেও বাঁচি। ফলে এই শক্তিকে নজরুল উভয় দিক থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন: সমষ্টিশক্তি ও আত্মশক্তি দুই-ই তাঁর কাছে বিশেষ জরুরি।

নজরুলের কবিতা পাঠে তাঁর কবি-চারিত্র্যের কয়েকটি সূত্র আমাদের কাছে খুব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি সূত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক, কবির উজ্জ্বল প্রত্যাশাঘন কণ্ঠস্বর, যা প্রায় প্রেরণার মত অপ্রতিরোধ্য, দুই, কবির অতন্দ্র ব্যক্তিসাধনা, তিন, অসুন্দর ও অসম্পূর্ণ জীবনে সম্পূর্ণতা ও সুন্দরের জন্য উদ্যমশীলতা, যার পরিণামে নিশ্চিত শুভ প্রতিশ্রুতি বলে কবি বিশ্বাস করেন। এখানে প্রথম সূত্রের প্রত্যাশাঘন কণ্ঠস্বর, ও তৃতীয় সূত্রের শেষাংশে যে পরিণামী 'শুভ'-র কথা বলা হয়েছে, এই দুই মোটামুটিভাবে এক: কবির অপরিমাণ আশাবাদ, বা বলা যায়, আদর্শবাদ। এবং এই আদর্শই কবির উদ্দিষ্ট। অপর যে দুই অংশ, অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্র, ও তৃতীয় সূত্রে কথিত উদ্যমশীলতা, —তা ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে অপরিহার্য উপকরণ।

উদ্দেশ্যরূপী আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে উপকরণ, নজরুলের কবিতায় এই দুই সূত্র অতি স্পষ্টভাবেই নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু সূত্রাশ্রয়ী আন্দোলনহীন প্রতিবেদন কবিতার মর্ম-লোক বোধ হয় উদ্ভাসিত হয় না, আন্দোলন-বিক্ষোভ-মুখরতা, এক অর্থে কম্পনঘনস্পন্দমান উপলব্ধির উচ্চারণেই কবিতার প্রাণস্ফূর্তি সম্ভব। নজরুলের কবিতায় যে এই কম্পন প্রতিশ্রুত, একথা নূতন করে বলবার দরকার নেই। এই কম্পন যে তাঁর কবিতায় সঞ্চারিত হতে পেরেছে তার কারণ সম্ভবত উদ্দেশ্য-

অর্জনের পথে উপস্থিত বিঘ্নসমূহ সম্পর্কে কবির সচেতনতা। পর পর নজরুলের তিনটি উক্তি প্রাসঙ্গিক কারণে এখানে উদ্ধার করা চলে :

১। 'ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না।'

২। 'দেবতা তার জল ঝড় নিয়ে, প্রকৃতি তার রোগ মহামারী নিয়ে তাকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আচার তার জগদ্দল পাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে—সমাজ তোর কণ্ঠরোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনী ঢেকেছে।'

৩ 'আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।'

এই উক্তিগুলি তাঁর বিঘ্ন-সচেতনতার সমর্থক। সাধারণভাবে দেখলে এই বিঘ্নগুলি তাঁর চেতনায় এই : (ক) পরাধীনতা : তার আনুসঙ্গিক বিকার সহ ; (খ) সামাজিক কুসংস্কার : অসাম্য ও অন্যায়ের বিচিত্ররূপ, (গ) সাম্প্রদায়িকতা।

তাঁর পরাধীনতার বোধ যে খুবই প্রখর ছিল, তার সমর্থনে নির্বিচারে কিছু উদ্ধৃতি সংকলন করা যেতে পারে : 'সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে' (ফরিয়াদ) ; নির্যাতনের যষ্টি দিয়া শক্র আঘাত হানে' বা, ফাঁসির রশ্মি ধরি' / আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা' (অন্ধ স্বদেশ দেবতা), সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার/দ্বীপান্তরের আন্দামান/···সেথান হতে কি বেতার-সেতারে/এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর ?' (দ্বীপান্তরের বন্দিনী), 'ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে!' (আমি গাই তারি গান), 'অধীন দেশের বাঁধন বেদন/কে এলো রে করতে ছেদন?' (পাগল পথিক), ইত্যাদি। লক্ষণীয় এই সব উক্তিতে শুধু পরাধীনতার বোধ নয়, একটা বরফ যে অদ্ভুত বিশ্বাসের উত্তাপে তরল হচ্ছে, তার মর্মরও শোনা যায়। 'দ্বীপান্তরের আন্দামান' বলে পরাধীনতার কর্কশ বাস্তবিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার পর 'বেতার-সেতার' প্রয়োগ করে কবি সুরমর্মর ধ্বনিত করতে পারেন নি, এমন কি 'সুর' শব্দও তার নগ্ন শাব্দিকতাকে অতিক্রম করতে পারে নি ঠিক, কিন্তু ওই 'মুক্ত-বন্ধ' শব্দবন্ধের প্রয়োগে এত উদ্যত যে, তার দ্বারাই সমানশক্তি প্রতিরোধের সাম্যে উচ্চারণকে প্রতিষ্ঠাদানে তিনি সক্ষম হয়েছেন। অথবা যখন তিনি বলেন, পরাধীনা অনাথিনী জননী আমার, বা দেশের অধীনতাকে 'বাঁধন বেদন' রূপে লক্ষ্য করেন, তখন তাঁর অনুভূতি এক নম্রমৃদু খাদে নেমে আসে বটে তবু উদ্যম-হীন অনুভূতিচর্চাতেই তিনি যে অবসিত হতে চান নি উদ্ধৃত পংক্তিগুলির মধ্যেই তার পরিচয় আছে। 'ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত কে এলোরে করতে ছেদন' ইত্যাদি অংশে অনুভূতিকে উদ্যত করে লালন করেছেন তিনি, এবং 'শাসতে

জুলুম নাশ্‌তে জোর/খদ্দর বাস বর্ম তোর রে' (চরকার গান), 'সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, (সব্যসাচী) ইত্যাদি অংশে সেই উদ্যমশীলতাকে শাণিত করে তুলতেই তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। এই দুইটি অংশে যে আপাতবিরোধ আছে, তা পথসন্ধানের অস্থিরতারই দ্যোতক, ফলে এই তথাকথিত বিরোধ পক্ষান্তরে তাঁর অনুভূতির উদ্যমী শক্তিকেই প্রত্যয়িত করে তোলে।

এইরকমভাবেই দেখা যাবে, বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার ও আনুষঙ্গিক বিচিত্ররূপ অন্যায় ও অসাম্যকে তিনি যে বিঘ্নস্বরূপতায় দেখেছেন, তার কারণ উদ্দেশ্য তথা আদর্শ অর্জনের পক্ষে তা প্রতিবন্ধক : এই বাধা তার অনুভূতিকে যখন আঘাত করে তখন তা উদ্যত হয়ে ওঠে, উদ্যমহীন নিশ্চয়তার আস্ফালনে কবি কখনোই অনুভূতিকে নিষ্ফল হয়ে যেতে দেন না। প্রকৃতপক্ষে আমরা এইখানেই নজরুল সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ভুল করে থাকি, উদ্যমশীলতা বা অনুভূতির ক্রিয়াশীলতার সূত্রটির দিক থেকে লক্ষ্য না করলে এইরকম প্রমাদ ঘটবেই। খুব কম কবির মধ্যেই অনুভূতিকে উদ্যোগীমার্গে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়, নজরুলের কবিতা এই দিক থেকে বাংলা কবিতায় যে খুবই বিশিষ্ট, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিচিত্ররূপ সামাজিক কুসংস্কার, সাম্য ও ন্যায়নীতির বিপর্যয় কবির চৈতন্যে সহজেই ধরা পড়েছে। 'সব্যসাচী' কবিতায় বিবেকহীন ধর্মাচরণের নিষ্ফলতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বললেন, 'পূজা করে শুধু পেয়েছি কদলী', কিন্তু আমাদের জীবন যে কতগুলি সংস্কারগণ্ডীর মধ্যেই চৈতন্যহীনভাবে আবদ্ধ, এই বাস্তবিকতার বোধটি তিনি আড়াল করেন নি : 'মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি/টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি'। তবু এইরকম বদ্ধতা যে কখনো কখনো জাগ্রত চৈতন্যেও ধরা পড়ে, 'আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার/মূল সর্বনাশের", (অন্তর ন্যাশনালসঙ্গীত) ইত্যাদি উক্তিই তার পরিচায়ক। যেখানে আচারবদ্ধতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়, অর্থাৎ তার মধ্যেই সর্বনাশের মূল যখন দেখা যায়, তখন চৈতন্যের উচ্চারণ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক. 'এরে ভাঙিব এবার'— এই ঘোষণা এখানে ফলত সঙ্গতিপূর্ণ লাগে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সনাক্তকরণ নয়, বাসনার প্রত্যক্ষ ঘোষণাও নয়, অসঙ্গতির মধ্যে জীবনধারণের যে অসহায়তা, ন্যায়-নীতি-স্বাভাবিকতার পরাজয়ে সততার যে বেদনা, নজরুল প্রধানত সেই আহত অনুভূতির চর্চার মাধ্যমেই অনুভূতির শক্তিকে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত/ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত

কাড়ছে থালার ভাত/মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই ক' আমার হাত'। (কৃষাণের গান), 'দারিদ্র্য অসহ/পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহবহ/আমার দুয়ার ধরি!' (দারিদ্র্য): 'ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি/আমরা মুটে কলখালাসী!' (শ্রমিকের গান): 'এক সমাজকে মানলে করবে/আরেক সমাজ নির্বাসন', (সত্য-মন্ত্র): ইত্যাদি পংক্তিতে আহত অনুভূতির অসহায়তা খুবই প্রকাশ্য। এই আহত অনুভূতিই ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখন তা অনায়াসে বলতে পারে, 'মাটাতে যাদের ঠেকে না চরণ/মাটীর মালিক তাঁহারাই হন—/যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান', ফরিয়াদ)। 'ভণ্ড', 'ধড়িবাজ'—এই শব্দগুলির প্রয়োগেই ক্ষোভের কণ্ঠস্বর এখানে ধ্বনিত, এই লগ্ন নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে অনুভূতির মুক্তির উষাকাল। এই ক্ষোভই আচরাৎ প্রশ্ন তোলে: 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছে জুয়া/ছুঁলেই তোর জাত যাবে?' জাতের বজ্জাতি), প্রথম পংক্তির তীব্র ক্ষোভ দ্বিতীয় পংক্তিতে আবশ্যাসের প্রশ্নে উত্তীর্ণ। এখন আর অসহায়তার কোন বেদনা নয়, এখন স্থির বুদ্ধি ঠিক করে নিতে পারে, 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন' আমার কৈফিয়ৎ), অথবা, 'শ্রমণের চেয়ে পূজ্য ভেবেছ শ্রম।' বিংশ শতাব্দী)। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটির মধ্যে অনুভূতি নিষ্ক্রিয়তার আড়াল থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে জীবিত ও উদ্যত হয়ে উঠছে, তার উন্মীলীয়মানতাই বিশেষ লক্ষণীয়। এর এই ক্রমানুসরণে বিপত্তি ঘটলে 'ভাঙ্গি মন্দির, ভাঙে মসজিদ/ভাঙ্গিয়া গির্জা গাহে সঙ্গীত—/এক মানবের একই রক্ত মেশা', —তারস্বর ঘোষণামাত্র বলে মনে হতে পারে, অথবা, 'যাহাদের নিঃশ্বাসে/জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।/যারা ভেঙ্গে চলে অপদেবতার মন্দির আস্তানা,/বক্-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা/যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,/সংস্কারের জগদ্দল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।' (আমি গাই তার গান),—তাদের গান তথা বন্দনা আবেগের আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত বলে ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়।

'হিন্দু-মুসলিম-যুদ্ধ' কবিতায় সম্প্রদায় সমন্বয়ের ভাষ্য রচনা করে কবি সাম্প্রদায়িকতার বিঘ্ন সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?' (কাণ্ডারী হুশিয়ার), এই প্রশ্নের ভয়াবহতাকে তিনি অতিক্রম করবার প্রয়াস পেয়েছেন বিশ্বাসের শক্তিতে, যেখানে 'হিন্দু মুসলিম দুই সোদর' (চরকার গান)—এই অনুভূতির প্রত্যয়ে তিনি সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। এবং বলা বাহুল্য, বিশ্বাস ও প্রত্যয় যে কোন জড় খণ্ডমাত্র নয়, বরং

তার দৃঢ়মূল বোধ, যা উত্তীর্ণ করে দেয়, তার মধ্যে যে কোন না কোন রকমে ক্রিয়াশীলতা বর্তমান থাকে, নজরুল অন্তত তার পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

এই সব অতি-নিরূপিত বিঘ্ন সম্পর্কে কবির সচেতনতা সর্বত্রই খুব প্রখররূপে উপস্থিত সন্দেহ নেই, কিন্তু কখনো কখনো এই সব যে প্রতিকারহীনভাবে প্রতিভাত হয়, নজরুলের কাব্য-পংক্তি অনুসরণে ইতিমধ্যে তা আমাদের গোচরে এসেচে। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে অতঃপর অনিবার্যরূপে উপস্থিত হয়ঃ আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতনতার দাবি। আত্মশক্তির অপরিমাণ, অফুরান উন্মীলনেই উপস্থিত বিঘ্নসমূহকে অতিক্রম করে যাওয়া যায়, অসহায়ভাবে আর তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হয় না। কাজেই নজরুলের কবিতায় তাঁর উদ্দেশ্য অর্জনের উপকরণ মোটামুটি দুইরকমের দেখা যায়ঃ এক, বিঘ্ন-সচেতনতা, দুই, আত্মশক্তির উপলব্ধি ও উদ্বোধন।

কবি-চেতনা এক অর্থে সমাজ-চৈতন্যেরই প্রতিরূপ বটে, কিন্তু কবি ভূমিকার আলংকারিক সামাজিক অবস্থান ব্যাপারটাকে নজরুল সম্ভবত খুব নিরাপদ বলে মনে করেন নি। কাজেই কবি-চৈতন্য বা এক অর্থে ব্যষ্টি-চৈতন্যকে সমাজ-চৈতন্য বা সমষ্টি-চৈতন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত বা উদ্বোধিত দেখতেই তিনি চেয়েছিলেন, এবং এই কাজটা তার কাছে খুব জরুরি ছিল। এই জরুরি-বোধ কবিতায় কতখানি কৃতার্থ হতে পারে, বা এ থেকে কবিতার কতটা উপকার হতে পারে, এই প্রশ্ন হয়তো অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত হবে না, তথাপি নজরুলের ক্ষেত্রে এই তথ্যটি খুব বিশিষ্টভাবে উপস্থিত, তা-ও সংশয়াতীত। কবির উদ্বোধিত চৈতন্য সমষ্টি-চৈতন্য-স্বরূপে প্রস্তুত চেয়েছে। এবং এখানেই কবির উদ্যমশীলতা। সমষ্টির মধ্যে চৈতন্যের উন্মেষ অর্থে সমষ্টির মুক্তিই তাঁর কৃত্য। সাধারণভাবে একে রাজনীতির ক্ষেত্র বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নৈতিকতাবোধেরই ক্ষেত্র মাত্র। এবং কোন কাব্যই বোধ হয় নীতিবোধের অবশ্যম্ভাবী বলয় থেকে মুক্ত নয়; নজরুলও, কবি বলেই জাগ্রত ছিলেন নৈতিক-চৈতন্যে। ফলে, দেখা যায়, নজরুল যখন কথা বলেন, তখন তা একদিকে তার নিজের কথা বটে, অর্থাৎ তার ব্যক্তি-কণ্ঠই সেখানে উচ্চারিত অবশ্য, তথাপি তা একই সঙ্গে সমষ্টিকণ্ঠও আবার। নজরুলের কবিতার উচ্চারণ-রীতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা যে পরিচয় গ্রহণ করেছি, তার বিশিষ্টতা, যে তাঁর এই মনোভাব, অর্থাৎ কবি-চৈতন্যের এই সত্যের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ, সংশ্লিষ্ট এবং অন্বিত, অতঃপর তা নিয়ে আর সংশয় থাকে না।

অসহায় আত্মদ্বন্দ্ব, প্রমথ চৌধুরীর কবিতা

পুলিনবিহারী সেন প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' সংকলন করতে গিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন, তা থেকে জানা যায় ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে কবির একখানি কবিতার খাতা সংকলনের ব্যাপারে তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি যদিও জানান নি এই খাতা থেকেই কানাই সামন্ত ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর পরামর্শ অনুযায়ী লেখকের জীবিতকালে অপ্রকাশিত কবিতার নির্বাচন করা হয়েছিল কিনা, কিন্তু অনেকগুলি কবিতার রচনার তারিখ ও স্থান এই খাতা থেকেই নির্দিষ্ট করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। সংকলক ও সম্পাদকরূপে পুলিনবিহারীর যোগ্যতা স্বীকৃত, এবং কালক্রমানুসরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্য বিবেচনায় ঐতিহাসিক পারম্পর্যের গুরুত্বের ওপর তিনি সবসময়েই জোর দিয়ে গেছেন। তাঁর হাতে সংকলিত হয়েছিল বলেই এই গ্রন্থে যে তথ্য নিরূপিত হয়েছে তার বাইরে তার কবিতা রচনার কাল-বিষয়ক আর কোন তথ্য তিনি পান নি বলেই মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়। এই তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কবিতার রচনাকাল ১৯১১, একটি 'তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন' যাকে বলা যায় চতুর্দশপদী মিত্রাক্ষর পয়ার, এবং অপরটি 'ওঁ' তাঁর লেখা সুপরিচিত একটি সনেট ; এবং দুটি কবিতাই 'পদচারণ' (১৯১৯)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

১৮৬৮-তে যাঁর জন্ম, তিনি ১৯১১-তে এসে প্রথম কবিতা লিখলেন, অর্থাৎ ৪২ বৎসর অতিক্রম করে তাঁর কবিতা লেখার সূত্রপাত। এত বেশি বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম কোন কবি আর আছেন কিনা জানিনা। এই দিক থেকে দেখতে গেলে কবি হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর লক্ষণীয়তা অবশ্যই একটু বিশেষ ধরণের।

এবং তিনি কবিতা রচনায় নিবেদিত ছিলেন মাত্র আট বৎসর কাল, ১৯১১ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে তিনি কতগুলি কবিতা লিখেছিলেন, সে তথ্য কেউ জানান নি ; কিন্তু পুলিনবিহারী সেন ১০৯টি কবিতার সংকলন করেছেন।[১] এত অল্প কবিতা লিখে বাংলা দেশে আর কোনও কবি বোধহয় সমালোচকদের এতখানি মনস্কতা পান নি।

১. এই গণনায় 'দোপাটি', 'দুয়ানি' ও 'সিকি'-কে এক একটি কবিতা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে।

সমালোচকরা প্রমথ চৌধুরীর কবিতার লক্ষণীয়তা সম্বন্ধে প্রত্যেকেই প্রায় অকপট, কিন্তু তার মনোজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্থ। চিন্তাশীলতার যে বেগ তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন বাংলা গদ্যে, বা গদ্যরীতির ক্ষেত্রে প্রায় বৈপ্লবিক রূপান্তরে যে নায়কত্ব দিয়েছিলেন, ঐতিহাসিক কারণেই তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই; এবং হতে পারে সমালোচকরা তাঁর কবিতাব একই ব্যক্তিত্বের সন্ধানকেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। অভিব্যক্তিধারার স্বতন্ত্রতার কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে থাকা উচিত কিনা, সে-কথা তাঁরা কেউ ভেবে দেখতে চান নি। তাছাড়া তাঁর গদ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাঁর কবিতার ঐতিহাসিক গুরুত্বের মাপ ও সমান নয়। তবু তাঁর কবিতাকে একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করবার আয়োজনই আমরা দেখি, এবং সম্ভবত কবি নিজেই তাঁর ভূমিকাটি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা প্রমথ চৌধুরীর যে চিঠিটি এই প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তার অংশ-বিশেষ এই রকম: 'সনেট' লেখবার অন্য কারণও ছিল—রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।' এ থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে তাঁর কবিতা প্রধানত প্রতিক্রিয়ার রচনা: অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর বিবেচনায় যেখানে পূর্ণমান, নূতন কবিদের অনুসরণ-প্রধান কবিতার অধিকাংশই সেখানে তাঁর কাছে বিরক্তিকর। রবীন্দ্র-কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তিনি এইভাবে প্রকাশ করেন:

ভারতী যাহার কলম ধ'রে
নিতি নব গান রচনা করে,
লিখে রাখে নভে, জলে ও স্থলে,
রূপের বারতা সোনার জলে।

এবং নকলনবীশ নূতন কবিদের পাশাপাশি জানিয়ে দিতে চান:

সাহিত্যজগতে থাক্-না রাজা।
পূজা নয় তার তামাক সাজা॥

স্পষ্টই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে তিনি কবিতার মুক্তি দেখতে পাননি, তিনি নূতন কবিদের স্বমিষ্ট দেখতেই চেয়েছিলেন। কবিতা সম্পর্কিত চিন্তার গোড়ার কথা এই রকম হওয়াই সম্ভব। এবং তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কবিতা বিরক্তিকর মাত্র কিনা, সে-সম্পর্কেও হয়তো কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। তাঁদের কবিতা যে 'জোর করা ভাব আর ধারকরা ভাষা'-রই কবিতা, এখন পর্যন্ত তা

কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা হয়নি, যেমন দেখা হয়নি তাঁর কল্পনার প্রকৃতি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম-করা শুধুই আকাশশায়ী কি না। এই সব কবিরা রবীন্দ্রনাথের শক্তি-কেন্দ্রের আবাসিক ছিলেন, তাঁকে নিয়ে উদ্দীপিত হয়েছেন, নিজেদের সীমাবন্ধনের মধ্যে থেকেই তাঁকে অনুসরণ করে গেছেন কেননা তাঁর কবিতা-পথে তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কোন সন্দেহ নেই তাঁদের হাতে আমরা পেয়েছিলাম রবীন্দ্র-কল্পনা ও রবীন্দ্রভাষার কিছু তরল সংস্করণ, কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা অনেকখানি বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন, উনিশ শতকীয় বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, তার নিরসনে এই সব কবিদের আত্মোৎসর্গ উপেক্ষণীয় নয়। 'আত্মোৎসর্গ' কথাটি এখানে যোগ্য হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু এঁরা যে নিজেদের আঙুল পুড়িয়ে আগুনকেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এঁরা রবীন্দ্র অনুসরণে সদগতি ভাবলেও কবিতার সদগতি যে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুত করতে পারেন নি বলে বলা হয় তার আংশিক কারণ তাঁদের শক্তির সীমাবন্ধনই অবশ্য, কিন্তু প্রধান কারণ সম্ভবত এক ধরনের দ্বিধা। রবীন্দ্র-পথের পদাতিকরা প্রায়ই উনিশ শতকীয় বাংলা কবিতার সংস্কার থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি, অর্থাৎ তাঁদের কবিতা অনেক সময়েই যখন উচ্চতর কল্পনায় উজ্জীবন পায়, তখনো বিষয়াশ্রয়ের সংলগ্নতা প্রত্যাশা করে।

কাজেই মনোঘুড়ি বুঁদ হলে তাঁরা যে লাটাই ছাড়েনই, এইরকম সাধারণীকৃত একটি মনোভাব তাঁদের সম্পর্কে সঠিক নয় বলেই মনে হয়। অবশ্য কথাটা প্রমথ চৌধুরী নিজের সম্বন্ধেই বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মকথা একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশের পটভূমির নির্দেশিকা।

৩

পটভূমিই তাঁর আত্মপ্রকাশের ভূমিটি তৈরী করে দিয়েছিল। এই পট-চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন যে, কবিকল্পনা সেখানে আকাশ-শায়ী এবং কবিরা ধোঁয়ার কারবারী, সেখানে কাব্য-ভাবের মধ্যে যেমন স্বাভাবিকতা নেই, কাব্য-ভাষাও তেমনি ধার করা, সেখানে কাব্যের বিষয় মোটামুটি হৃদয়ভোলানো প্রেম ও ত্রিশঙ্কুর নারী, সেখানে সুনীতি ও সুরুচির শৃঙ্খলে কবিতা আবদ্ধ, সেখানে ঠকামি ও ন্যাকামি-পূর্ণ অসহ্য গুরুগিরি, সেখানে তামাক সাজানোয় অভ্যস্ত মাছি-মারা কবিদের সতত আত্মহত্যা। এইভাবেই সমকালীন বাংলা কবিতার পর্যালোচনা করলেন তিনি এবং বাংলা কবিতার এই পরিচয়ের মধ্যে যে স্বাস্থ্য ও উদ্ধারের

কোন বার্তা নেই, তাঁর বিবেচনায় অন্তত তা ধরা পড়েছিল। অর্থাৎ তাঁর অনেকগুলি কবিতার মধ্যে তিনি উন্মোচিত হলেন সাহিত্যের ভাষ্যকার রূপে, আর এই পরিচয়েই তিনি সম্ভবত মোটামুটি খুশি ছিলেন, অন্তত উচ্চারণের স্ফূর্তিতে এই রকম একটা ধারণা হতে পারে।

সাহিত্য-ভাষ্যকারের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি আরও কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। সংস্কৃত কবি ও নায়িকাদের নিয়ে লেখা কবিতাগুলি এরমধ্যে পড়ে। ভাস, জয়দেব, ভর্তৃহরি, বসন্তসেনা পত্রলেখা ইত্যাদি কবিতায় সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহপূর্ণ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। এই ধরনের কবিতা লেখার পেছনে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের সংস্কারই কোনও না কোনও রকমে কাজ করে থাকতে পারে অবশ্য। একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে কবিদের নিয়ে কবিতা লিখে তিনি মধুসূদনীয় শিষ্টাচার মাত্র দেখালেন না, তিনি এই সব সংস্কৃত কবিদের রচনায় নীরোগ স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল যৌবনচিহ্ন, যোগ ও ভোগের সমমাপ জীবনপিপাসার আস্বাদনে দীপিত হলেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এইসব বাঞ্ছিত লক্ষণের অনুপস্থিতি তাঁকে এই ধরনের কবিতা লেখায় অনেকখানি উৎসাহিত করে থাকবে। এইখানে তিনি প্রধানত ভাষ্যরচনার কাজই করলেন; একদিকে সন্ধান করলেন সংস্কৃত সাহিত্যের আকর্ষণীয়তার ভূমি, অপরদিকে ক্ষোভ দেখলেন বর্তমান বাংলা সাহিত্যে রক্তহীনতায়। নঙর্থক দিকই সচরাচর সদর্থক দিকের সন্ধানী করে তোলে, এবং এই কবিতার মধ্যে এই ধরণের সমস্তত্বই কাজ করেছিল বলে মনে হয়।

এমন কি, কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কবিতা রচনা করতেও তিনি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। কবিতার আঙ্গিক, যেমন সাধারণভাবে সনেট বা বিশিষ্টভাবে নিজের সনেট তাঁর কবিতার প্রসঙ্গ রূপে গৃহীত হয়েছে। এইসব কবিতায় কবিতার উৎসে হৃদয়ঘটিত বেদনার কথা যেমন অস্বীকার করা হয় নি, তেমনি কল্পনার ক্রিয়াশীলতার বেগ লক্ষ্য করা হয়েছে। ভাবের অসীমতা ও ভাষার সীমার মীমাংসা কবিকে যে করতেই হয়, কাব্যসৃষ্টির এই কঠিন সাধনবেগের মুখোমুখিও হতে হয়েছে তাঁকে। আকৃতিতে ছোট হলেও প্রকৃতিতে যে বড়, সনেট-প্রকরণের এই চরিতার্থ বিশিষ্টতার কথা ঘোষণা করেও ভাবের বৃহদ্‌ত্ব আধারের ক্ষুদ্রত্ব নিয়ে সনেটকারের যে সমস্যা তৈরী হয়ে যায়, তিনি তার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছেন। এখানে কবিতা ও সৃষ্টিশীলতা সম্বন্ধে তাঁর তাত্ত্বিক মনোভাবের ভাষ্যই প্রধানভাবে চোখে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে, কবিতার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী অনেকখানি সাহিত্যের ভাষ্যকার মাত্র। এই ভাষ্য রচনার মধ্য দিয়েই তিনি অবশ্য খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন কবি

হিসেবে নিজের ভূমিকাটিকে, এবং তাঁর কবিতার অপর বড় অংশ সেই কারণে স্বভাবতই কবিতায় আপনভূমির সন্ধান। এই অনুসন্ধান যতটা মৌলিক সৃষ্টির অন্তর্গত রূপে লক্ষণীয়, তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিগত টানাপোড়েনে রচিত প্রায় নিজের সঙ্গে তর্কে। তর্ক স্বাভাবিকভাবেই দ্বন্দ্বমূলক ; তাঁর এই ধরনের কবিতায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্ভবত কবির আত্মদ্বন্দ্বের এক অসহায়তা।

৪

নিরাবরণ আত্মপ্রকাশ অসম্ভব বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করতেন। কবিতার কথা, তাঁর মতে, বানানো কথা, 'মিছে কথা।' কেননা, 'অন্তরের রহস্যের সঠিক বারতা / কথায় প্রকাশ পায়, এটি মিছে কথা।' শিলং-এ লেখা 'আত্মপ্রকাশ' কবিতার এই বিশ্বাসভূমিটি আট মাস পরে লেখা 'পত্র' কবিতায়ও স্খলিত হয়নি। ফলে বোঝা যায় ভাষার সীমাবন্ধন সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। কবিতায় মনের ভাব তার পরিপূর্ণ আয়তন নিয়ে স্বভাবতই ধরা দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও শেষ বয়সে ভাষার ওপর কতটা বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন অবশ্য। কিন্তু তিনিই সারাজীবন ধরে ভাব ও ভাষার অদ্বৈত প্রতিষ্ঠার সাধনায় নিবেদিত ছিলেন। বস্তুত, কবিদেরই এই কাজ করতে হয়, তিনি কিভাবে তা করবেন, সেটা তাঁর সমস্যা ও শক্তির প্রশ্ন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই একটা অবিশ্বাসের ভূমি তৈরী করে নিয়েছিলেন, এবং এই রকম নিরূপিত ভূমি থেকে কবিতাচর্চায় সদর্থকভাবে কতটা এগোনো যায়, তা নিয়ে স্বভাবতই সংশয় থাকতে পারে।

'অথচ তিনি কবিতাই লিখেছিলেন। তিনি যতই বলুন

কপালেতে ছিল লেখা তাই আজ শিখি লেখা
অবসর পেলে।'

তিনি যে অদৃষ্টবশে লেখক, একথা নিশ্চয় কেউ বলবেন না। বরং বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও তার মতো অত্যন্ত সচেতন শিল্পী খুব একটা বেশি দেখা যায় না। আসলে, ভাব ও ভাষার ঐক্য-বিষয়ক সমস্যার মূল কেন্দ্র তাঁর ক্ষেত্রে অন্য রকম ছিল। তিনি স্পষ্টই জানেন,

অথবা হৃদয় যদি অনলেতে পোড়ে,
ভাব ভাষা দুই গ'লে নিজে হতে জোড়ে।

কাব্যের উৎসমুখে যে বেদনার সংস্থান, যাকে আরেকটু প্রসারিত করে সম্ভবত বলা যায় কাব্যের আবেগ, প্রমথ চৌধুরী কবিতার সেই ভাব-ব্যাকরণের বিরোধী

ছিলেন না। তাঁর ক্ষেত্রে সমস্যাটা এই আবেগ ঘটিত সমস্যার রূপ নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল। ‘সাহিত্য’ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে নিবেদিত পত্র-কবিতায় এই সমস্যার রূপটি তিনি চমৎকারভাবে উপহার দিয়েছেন :

কল্পনা কম্বোজ-ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া,
চলে তিন পায়ে।
ভোঁতা হল পঞ্চবাণ প্রেমের উজান বান
নাহি ড'কে মনে।

সমাজের পোষা পাখি সমাজ-খাঁচায় থাকি,
ভুলে গেছি বনে।
এখন দখিনে বায় শুধু মিষ্টি লাগে গায়,
হাড়েতে লাগে না।
মলয়ের মন্দ ফুঁয়ে হৃদয় গেলেও ছুঁয়ে,
হৃদয় জাগে না।

তাহলে তাঁর সমস্যা হৃদয়ের জাগরণের সমস্যা। তরুণ বয়সে অনুভূতির যে তীক্ষ্ণতা থাকে, আবেগের যে উৎসার অকুণ্ঠিতভাবে সম্ভবপর হয়, বেশি বয়সে তার সতেজ স্বাভাবিকতা হয়তো খানিকটা কমে আসে ; এবং প্রমথ চৌধুরী চল্লিশোর্ধে কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে হৃদয়ের জাগরণ ছাড়া কবিতার আর কোন ছাড়পত্র নেই, কিন্তু কবিতার আবেগ বা অনুভূতিময় উন্মুখতা শুধুই বয়সের ওপর নির্ভরশীল, এই রকম মনোভাব অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না। যে কোন সৎ কবিতা সৎ অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি, এবং তা স্বভাবতই বয়স নিরপেক্ষ। প্রমথ চৌধুরীও যে তা বিলক্ষণ জানতেন, কখনো কখনোও তা সহজেই বোঝা যায়। ইন্দিরা দেবীকে লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশ এই রকম :

আমি যা চোখের আড়াল করে রাখতে চাই—মনের অসহ্য আবেগ, অনন্ত কামনা, অসীম অতৃপ্তি—Shelley-র প্রতি পাতায় পাতায় তাই। এক একটি কথা হৃদয়ে ছুরির মত বেঁধে, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত গায়ে এসে পড়ে।

এই চিঠির মধ্যে হঠাৎ তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন যেন, কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম যা এতক্ষণ খুঁজে যাচ্ছিলাম, অর্থাৎ সেই হৃদয়, যার জ্বলন্ত জাগরণে কাব্যপ্রকাশ। বয়স যে হৃদয়ের উদ্বোধনের প্রতিবন্ধক নয়, সেই কথাটাই যেন স্বয়ং কবির কাছ থেকে জানতে পারা গেল। তাঁর কবিতা ফলত আবেগহীনতার ফসল নয়, তিনি সচেতনভাবে চেয়েছিলেন আবেগের কণ্ঠরোধ।

কণ্ঠরোধ করতে বাইরের দিক থেকে শারীরিক বলপ্রয়োগের দরকার, তাঁর কবিতাতেও অনেক সময় মনে হবে, বাইরের দিক থেকে ঠাট্টায় বা শব্দ-প্রয়োগের উদ্ভটত্বে এই রকম করবার অত্যন্ত চোখে দেখা চেষ্টা আছে একটা। তাঁর পত্রলেখা রক্তাম্বরে হৃদয় সম্বরণ করে রাখে, তাঁর কবিতাও বাহির আয়োজনের আঘাতজনিত রক্ত-প্রচ্ছদে হৃদয়কে আড়ালে রাখতে চায়।

৫

প্রমথ চৌধুরী কবিতা লিখেছিলেন সযত্ন কাব্যপাঠে পরিশীলিত মন নিয়ে, অভ্যস্ত কাব্যবোধ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অনুজ্ঞায় যা কখনো কখনো উদ্ধত বলে মনে হতে পারে অথচ যা যৌবনেরই চিহ্ন বহনকারী। তাঁর কবিতা সম্পর্কে এই ধরনের বিবেচনা কিছু বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক তথ্যই উপহার দেয়। আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে কেন তিনি কবিতাকেই গ্রহণ করেছিলেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা না হলে তাঁর কবিতার যোগ্যতা বিষয়ক প্রশ্নের নিরসন হয় না। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, যে আবেগের হাত থেকে কবিতার উদ্ধার যে সম্ভব নয় তা তিনি বুঝেছিলেন, এবং মানুষ ও সৃষ্টির মূল সত্যটিকে প্রকাশ করতে গিয়ে অকপটে লিখেছিলেন, 'অতৃপ্ত হৃদয় কাঁদে।' এই বেদনার যোগটাই সম্ভবত কবিতার বিশ্বাসযোগ্য ভূমি তৈরী করে দেয়।

তাঁর মনে কবিতার বেদনা জন্মালো কিনা, প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে বিবেচনায় এই জিজ্ঞাসা কখনো কখনো মনে আসে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি যখন কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, প্রৌঢ়ত্বে বেশি বয়সের মুখোমুখি সমতল ও নিস্তরঙ্গ ঠাণ্ডা জীবনে যখন তিনি বন্দী, তাঁর মনে তখন এক আশ্চর্য বেদনার জন্ম ; এই বেদনা কবিতার জন্যে অন্তরের গাঢ় বিষাদের পরিচয় বহন করে। তিনি লিখলেন :

আজি সে ফুলের গন্ধ রয়েছে সঞ্চিত
অস্পষ্ট স্মৃতির মতো, সব মন ছেয়ে।
দেবতার স্থিরনেত্র, পূর্বপরিচিত,
রত্নদীপশিখা-সম, দূরে আছে চেয়ে।

এই কবিতার নাম 'স্মৃতি', এবং স্মৃতি মাত্রেই রত্নদীপশিখা। তাই অতিক্রান্ত যৌবনও স্বর্ণপুরী। 'অপরাহ্ণ' কবিতাটি মনে পড়ে। প্রৌঢ়ত্বের মোহভঙ্গের হতাশা, যৌবনের আশাভঙ্গের বেদনার সেই কবিতা। মধুসূদনের হাহাকার বা তাঁর সেই মর্মভেদী আত্মবিচার এতে যদিও নেই, তবু এক বিশ্লেষণ প্রবণ-কবি

মনের নিরাসক্তি সহজেই এখানে মুদ্রিত হয়ে আছে। যৌবনের আশা, তার গোলাপাকীর্ণ জীবনভূমি, তার সুকুমার কল্পনা, বসন্ত যেমন গ্রীষ্মের শুষ্কতায় অবসিত হয়ে যায়, তেমনি করে হারিয়ে গেছে উত্তীর্ণ যৌবনের মূঢ় বাস্তবের রুক্ষতার মধ্যে। এই অবস্থাকে কবি প্রবাস বলে মনে করেছেন, গোলাপের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন এক ধূসর বৈরাগ্য ও অর্থহীন হৃতস্বাদ মহাশূন্যতার মধ্যে :

যৌবনের স্বর্ণপুরী গিয়াছে টুটিয়া—
মহাশূন্য-মাঝে আজি করি ধুলাখেলা॥

'ধূলাখেলা' শব্দটির মধ্যে যে আর্তনাদ আছে, তা আমাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না, তবু ওই শব্দবন্ধের মাধ্যমেই নিষ্ঠুরতাকে অনুমতিক্রমণীয় শান্ত প্রতীকে ধারণ করে রাখলেন তিনি। এই রিক্ত মনোবেদন প্রমথ চৌধুরীর কবিতার হাস্য আস্বাদনভূমিটি চিহ্নিত করে দেয়।

'ব্যর্থ বৈরাগ্য' কবিতাটির কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে। নৈরাশ্যবাদের দর্শন একটা প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কবিতাটিতে তরঙ্গিত হয়েছে। গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও তিনি যদিও প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাসে সমর্পিত হতে চান, তথাপি কবি যেন কখনোই ভুলতে পারেন না যে, জীবনের পেছনে রয়েছে একটা নিছক নিয়মানুবর্তন, ভাগ্য; 'বিরাম মানে না স্রোত, বহে খরধার।' অথবা, 'জীবনের স্রোত চলে দক্ষিণবাহিনী।' যৌবনের দিনগুলি ফুরিয়ে গেছে, তার সুর ও সম্ভাবনা আজ লুপ্ত, —কবির জীবনে এ এক নূতন অধ্যায়। প্রতিটি দিন আজ স্বতন্ত্র; অতীত কেবলই অতীত, অনাত্মীয় ও তাৎপর্যবিহীন। কিন্তু সত্যি কি অনাত্মীয় ও তাৎপর্যহীন? শুধুই কি 'উত্তরে পড়িয়া থাকে পূর্বের কাহিনী'? যদি এই অনিবার্য অলঙ্ঘনীয়, তবু ফিরে ফিরে আসে 'কালকের ফুল', 'কালকের ভুল'-এর কথা, যে সুর কানে বাজতো সেই সুরের কথা; ঝরা ফুলে ভরা যে বিশ্ব, সেই বিশ্বের ওপর কালকের ফুলই তো আজও ঝরে পড়ে আছে।

বোধহয় বিস্মরণ অসম্ভব ত্রিকালে।

কিন্তু যুগস্মৃতি? কবি বলেন; 'মন কিন্তু যুগস্মৃতি করে না সঞ্চয়।' তাঁর 'পরিচয়' কবিতাটি পড়লে, তাঁর এই আটপৌরে তত্ত্বদর্শিতা সত্যি কি কোন মানে পায়?

দেখেছি তোমায় কোনো মাধবী পার্বণে;

কবিতার এই প্রথম পংক্তিটি প্রথমেই আমাদের চমকে দেয়, ১৯১৩ র জানুয়ারির কলকাতায় প্রায় সুধীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনলে চমকে ওঠাই স্বাভাবিক। প্রকৃতি,

নারী, সৌন্দর্য কোন সীমায় একাকার হয়ে গেছে এই তুমি-র মধ্যে। আর এই মাধবীর আবির্ভাবেও কোন দ্বিধা ছিল না। কেননা, 'তোমা-সনে ছিল জানি পূর্ব-পরিচয়।' তাহলে এই তুমি একই সঙ্গে পূর্বা, যার আবির্ভাব কোন মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণে যা দূর ও অতীত, যার বিকাশ রূপের প্রসারে 'গগন-সীমান্তে কোনো বিস্মৃত ভুবনে।' কবিকে লিখতেই হলো 'বিস্মৃত' শব্দটি, স্মৃতির উন্মীলন ছাড়া যে বিস্মৃতির চেতনা অসাধ্য।

এই উন্মীলিত স্মৃতিতেই কবির হৃদয়ের জাগরণ প্রতিশ্রুত হয়ে যায়। কোরকে তার বেদনা, যা তাঁকে বিষণ্ণ করে রাখে, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী কাঁদতে জানেন না। তিনি তথ্যের মতো জানেন 'নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,' অথচ বোধে ধরা পড়ে :

মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।

তিনি যে কাঁদতে পারেন না তার কারণ তাঁর বেদনার সঙ্গে চিন্তার যোগ। তিনি যখন জানেন, 'জীবনের প্রতি ব্যর্থ পল/ স্মৃতিতে একত্র করা, অতীতে কুড়িয়ে॥' তখনো তাঁর মনে হয় এই সব 'বৃথা কাজ।' স্মৃতির হাত থেকে মুক্তি নেই, অথচ স্মৃতিও মুক্তি দেয় না। 'বৃথা', 'ব্যর্থ' শব্দগুলি তাই ফিরে ফিরে আসে, একটা অভাবাত্মক বোধ ঘন হয়ে উঠতে চায়, জীবন সম্পর্কে এক নির্লিপ্ত উদাসীনতার ভাবনা কখনো কখনো আক্রমণ করে।

এর কারণ স্পষ্টতই একটা, জীবনের ক্ষণিকতা। ভালোবাসা ব্যাপ্ত করে, পেতে চায় ব্যাপ্ত জীবনকেই, অথচ 'জীবনের দিবসের স্বল্প পরিসর'—একথাটা কখনোই ভোলা যায় না। বকুলতলায় মনের সঙ্গে মন গাঁথার সেই লগ্ন মিথ্যে ছিল না, তবু 'বকুলের গন্ধ বলো কতদিন রয় ?' ব্যক্তি হৃদয়ের স্নিগ্ধ সঞ্চয় নিয়ে এই জিজ্ঞাসা পরমুহূর্তেই আবার বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে :

সেদিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি,
সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।
—বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয় ?

তারাশঙ্করের কবি গান বেঁধেছিল : 'জীবন এত ছোট ক্যানে' ; প্রমথ চৌধুরী বিষণ্ণ হয়ে বললেন : কতক্ষণ ? কতদিন ? বিসর্জনের ঘণ্টা ঢাকীরা অবশেষে বাজাবেই বলে যা চাই তা আজই, আজই, আজই—কোন তরুণ কবি একথা বলতে পারেন, কিন্তু চল্লিশ পেরিয়ে আসা কবির কাছে জরুরির বোধও বোধহয় ক্ষীণ হয়ে যায়। শান্ত ম্লান কণ্ঠে তিনি শুধুই বলতে পারেন, কতক্ষণ ? কতদিন ?

৬

কাজেই ১৯১২-র শিলঙে বসে হাতে তিনি যতই বার্নার্ড শ-র চাবুক চান, যতই বলুন, 'আমি ভালো নাহি বাসি/দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল'; তবু লক্ষ্য করা যাবে যে ১৯১৩-র জানুয়ারির কলকাতায় বসে তাঁকে তার সংশোধনী লিখতে হচ্ছে:

যতই দিই না আমি হাসিতে উড়িয়ে,
সমাজের সংসারের অন্ধ ক্রুর বল—
সে তো শুধু খেলা মাত্র, শুধু বাক্‌ছল,
এখনো যায়নি প্রাণ একান্ত জুড়িয়ে!

নয়ন যখন দিই হাসিতে মুড়িয়ে,
লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল।

সন্দেহ নেই, স্বাগত এই সংশোধনী; এ যে মাটির নীচে জলের মতো ঠাট্টা বা ক্রোধের নীচেকার বেদনা মাত্র নয়, তা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি, সহজেই চিনে নিতে পারি, এ একটা ভঙ্গি, খুব বাইরেকার জিনিস, যাকে নিয়ে সমস্ত কাব্য জীবন ধরে শুধুই বিব্রত হয়েছেন, এবং যাকে কিছুতেই কাব্যপ্রকাশের সত্যভূমির সঙ্গে মেলাতে পারলেন না।

পারলেন না যে, সেটাই স্বাভাবিক; কেননা ঈশ্বর গুপ্ত আর প্রমথ চৌধুরীর কবিতার সংবেদনার ভূমি এক নয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রধান অংশের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রেরণা আছে, কিন্তু কোন্ চাবুক দিয়ে প্রমথ চৌধুরী তাঁর এই কাব্য অভিপ্রায়ের নিষ্পত্তি করবেন?

মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই ছুঁয়ে বিয়ে,
সসীমে অসীম।
যত কিছু লেখাপড়া, তার অর্থ শুধু গড়া
মাটির পিদিম।

এবং সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর কবিতার প্রথম সমালোচকেরা ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের মান রক্ষা করেও তাঁর কবিতা বিষয়ে চমৎকার বিবেচনার প্রচ্ছন্ন পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'বীণাপাণিকে প্রমথ খড়্গপাণির মূর্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন', অথবা, 'এ যেন ইস্পাতের ছুরি', তখন তাঁর কবিতার একটি প্রকরণগত বিশিষ্টতার প্রতিই তিনি নির্দেশ করেন বটে, কিন্তু তা যে কাব্যোৎকর্ষেরই ব্যাখ্যা, এ কথা মনে করবার সামান্য ইঙ্গিতও তিনি দেন নি।

বরং তিনি আশা প্রকাশ করেছেন : 'এখন পাঠকের মনকে প্রতিচ্ছন্নে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে, সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে।' এ যে স্পষ্টতই তাঁর ভঙ্গির বহিরঙ্গতার ওপর সস্নেহ ক্ষমপূর্ণ ভৎর্সনা, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

তবু তাঁর কথাভঙ্গিতে যে এক ধরন-এর আঘাতশীলতা আছে, যা প্রধানত যে কোন প্রকারের অভ্যাসকেই মাত্র আঘাত করতে চায়, তার প্রতিই আমাদের মনোযোগকে টেনে নিতে সমালোচকরা কেন যে এতখানি উদ্যোগ দেখালেন, এখনো তা আমরা জানি না। সরস্বতীকে তিনি 'বনেট' পরালেন, এবং সরস্বতী বিষয়ে আমাদের সিদ্ধ ধারণার বিপর্যয় হলো, একটা জার্ক আমাদের মনকে সজাগ করে তুললো,—এই রকম ব্যাখ্যায় তাঁর কবিতার বিশিষ্টতা বোঝা গেল বলে আজকে বোধহয় অনেকেই মনে করবেন না। আসলে তো বিজাতীয় পরিচ্ছদের কথাই বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করে তিনি বললেন মাত্র, যা আগেই তিনি বলে গেছেন : 'ইতালির ছাঁচে ঢেলে বাঙালির ছন্দ'। অথচ এই উদাহরণকে নিয়েই তাঁর শব্দ ব্যবহারে আধুনিক মনস্কতার পরিচায়নে অগ্রসর হওয়া যেতো, যা দুর্ভাগ্যবশত আমরা করতে চাই নি। প্রিয়নাথ সেন অবশ্য এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন : 'তিনি কোনো শ্রেণীর শব্দকেই নির্বাসিত করেন নাই। অভঙ্গকুলীন "সাধু" শব্দের সঙ্গে তিনি জাতিহীন "ইতর" শব্দকেও এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন।' কিন্তু তিনিও 'দরকারী ভাব আর সরকারী ভাষা'-র প্রতি কবির অশ্রদ্ধার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর শব্দভাবনা-বিষয়ক নিতান্তই সাহিত্যিক একটি সচেতনাকে সম্ভাবনামূলক দৃষ্টিতে না দেখে শুধুই অবরুদ্ধ করে রাখলেন, এবং প্রতিক্রিয়াজনিত একটি লক্ষণে তাকে স্থাপন করলেন মাত্র।

এই সব বিচিত্র শব্দ-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি কতখানি ব্যঙ্গের বা অভ্যাসের ওপর আঘাতের ফললাভ চেয়েছিলেন জানি না, তবে তিনি যে শব্দাহরণের বিচিত্রতায় কবিতার ভাষাকে কথ্যভঙ্গির কাছাকাছি আনবার অনেকটা চেষ্টা করে গেছেন, সে সম্বন্ধে বোধহয় সংশয় নেই। তাঁর এই চেষ্টার উদাহরণ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রচলিত বাগ্ধারাকে কাব্যভাষার অঙ্গীভূত করে নেওয়ায়। দফা নিকেশ, গুড়ে বালি, তলা ফেঁসে যাওয়া, দুর্গা বলে ভাসা, গলায় দড়ি দেওয়া, হ য ব র ল, গাঁট কাটা, বুকের ছাতি ফোলানো ইত্যাদি আরো অনেক প্রচলিত বঙ্গীয় বাগ্ধারা তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে গেছেন, যা কাব্যভাষা সম্পর্কে তাঁর বাঞ্ছিত চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দেয়। তাঁর কবিতার দেহে

পাশ্চাত্য মডেলের অনুসরণজাত অভিনবত্ব ছাড়া ছন্দোগত কোনো যুক্তি নেই, বাংলা ছন্দের বহু পরিচিত নিরূপিত কাঠামোর মধ্যেই তিনি প্রধানত বন্দী। ঈশ্বর গুপ্তীয় চতুর্দশ অক্ষরবদ্ধ অপ্রবহমান পয়ারের বদ্ধদশার মধ্যে তিনি কথ্য-ভঙ্গির যোগ স্থাপন করে বাংলা কবিতার ভাষা-বিষয়ক চিন্তায় অবশ্যই একটি নূতন মাত্রা যোগ করলেন। ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বর গুপ্তর মধ্যে এই লক্ষণ অনেকাংশে থাকলেও আধুনিক কবিতার ভাষা সাধনায় প্রমথ চৌধুরীর চেষ্টার ভূমিকা লঘু হয়ে যায় না। কবিতার প্রচলিত সিদ্ধ ভাষার সঙ্গে কথ্যভঙ্গির বা বিস্তৃত অর্থে গদ্যভঙ্গির যোগ সাধনায় পরবর্তী বাংলা কবিতাকে আমরা মনস্ক হতে দেখেছি।

কথ্যভঙ্গির মধ্যে প্রবহমানতার বেগ থাকে ; ছন্দে চোখে-দেখা প্রবহমানতা যেখানে নেই, সেখানেও তা সহজেই প্রতিশ্রুত হতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় সাধারণভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রবহমানতা নেই, কিন্তু শুধু এই কারণেই কি তাঁর পয়ারে ঈশ্বর গুপ্তর পয়ার-আদর্শ খুঁজতে হবে? তিনি যখন লেখেন,

পয়সা করি নি আমি পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি নি কেতাব॥

বা,

অলক্ষিতে খসে গেছে মায়া-হস্তুলি।
এ বিশ্ব মাটির গড়া দেখি চক্ষু খুলি।

তখন এমন কি যতিচিহ্ন সহ তাঁর পয়ারের বন্ধননিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন লেখেন,

রাত্রি হাতে সঁপে দেয় দিবা যবে সন্ধ্যা,
পরায়ে তাহার অঙ্গে গাঢ় লাল আলো,
—নিশা যারে ক্রোড়ে ধরে দিয়া বাহু কালো—
সেই লগ্নে ফোট' তুমি, রে রজনীগন্ধা!

তখনো কি এর পরিচয় একই হবে? এখানে পদ, পর্ব বা যতির ক্ষেত্রে কোন নিয়মভঙ্গ নেই, তবু অপ্রবহমান পয়ারের উদাহরণ রূপে একে গ্রহণ করতে দ্বিধা হবেই। কমা বা ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করে, প্রথম পংক্তিতে 'যবে' আর চতুর্থ পংক্তিতে 'সেই লগ্নে' (যখন/তখন) প্রয়োগ করে পুরো চতুষ্ক নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন একটিই বাক্য, ছেদ ও যতির বিপর্যয় না ঘটিয়েও সহজেই সঞ্চারিত হয়ে গেল এক ধরনের প্রবহমানতা। একে অন্বয়ঘটিত বা Syntactical প্রবহমানতা বললে সম্ভবত অন্যায় হয় না। এ সবই কবিতার উচ্চারণ সম্বন্ধে তাঁর মনস্কতার পরিচয় দেয়, তিনি যে কপাল গুণে বা কপাল ঠুকে কবিতা লেখেন নি, সেটা স্পষ্টই

বোঝা যায়। এই রকম সজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে কবি হিসেবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিশিষ্ট ও লক্ষনীয় হয়ে ওঠেন, একটি সদর্থক ভূমিতে দাঁড়িয়েই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

৭

তবু সবই যেন থাকে ছিন্ন বিশিষ্টতার উদাহরণ হয়ে; সৃষ্টিশীলতার যে সংশ্লেষণী শক্তি বিশিষ্ট উপাদানকে শিল্পিত উচ্চারণে উত্তীর্ণ করে, যেকোন কারণেই হোক, প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় তার অভাব ছিল। এই বিচার কিভাবে হবে, তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে অবশ্য। কয়েকটি কবিতায়, যেমন 'বার্নার্ড শ' বা 'বালিকা-বধূ', যেখানে তিনি মর্মজ্ঞ সমাজশিক্ষক হতে চান, তাঁর বহু-প্রশংসিত ভঙ্গির একটা মানে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কাব্য-সংকলন কেউ যদি মনোযোগ দিয়ে পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, সামাজিক দায়িত্ববোধ তাঁর প্রধান কাব্যপ্রেরণা নয়। দেখা যাবে, তাঁর সাহিত্য-ভাষ্যমূলক কবিতাগুলিতে, পুষ্পবিষয়ক ও প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায়, বা প্রেম, জীবনান্বেষণ ও আবেগধর্মী মুহূর্তযাপনের কবিতার রেখাতেই তাঁর কবিতার ভূগোল-সীমা চিহ্নিত হয়ে আছে। এই সব ক্ষেত্রে, হৃদয়াবেগের জাগ্রত ভূমি থেকেই যেখানে তাঁর কবিতার জন্ম, তিনি কিছুতেই তাঁর তথাকথিত নিজস্ব ভঙ্গিকে মেলাতে পারেন না। সে ফুল হবে না পাতা হবে—কাঁঠালী চাঁপার এই প্রকৃতিগত দ্বিধার উদ্‌ঘাটনে কাব্য-কল্পনার যে চমৎকারিত্ব প্রকাশ পায়, 'দু' মনা করাই তব দুর্গতির মূল'—অব্যবহিত এই শব্দার্থবদ্ধ গদ্যভাষণ, বা 'সর্বধর্মসমন্বয় লোভে হয়ে অন্ধ/স্বধর্ম হারিয়ে হলে সর্বজাতি বার'—এই চ্যুত প্রসঙ্গের সাংবাদিকতাধর্মী প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ এক বিষম তৈরী করে তোলে। এটাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল বললে একটা ব্যাখ্যা হয় বটে, কিন্তু কাব্য-মীমাংসা হয় না। ভিতর চায় তার আত্মপ্রকাশ, বাহির তাকে রুদ্ধ করে, এবং এই ভাবে তাঁর কবিতায় কখনো একটা দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়, আর তার মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে কবির অসহায়তা। আসলে কাব্যকল্পনা যে একটা আসমানী ব্যাপার, এই রকম একটা ধারণার তিনি যে বশবর্তী ছিলেন, এমনও নয়। 'রজনীগন্ধা' কবিতাটির কথাই ধরা যায়। মিলন মাধুর্যকে আত্মসাৎ করে বিবাহের লগ্নে রজনীগন্ধার আবির্ভাব। দিবা সন্ধ্যাকে রাত্রির হাতে সমর্পণ করে; রক্তরঙীন দিকচক্রবাল বিবাহশয্যা; নিশা তার কালো বাহু দিয়ে গ্রহণ করছে এই রক্তিম সন্ধ্যাকে। এই গ্রহণের মূল্যে, সমর্পণের লগ্নে ফুল ফুটে ওঠে, তারপর রাত্রি; পৃথিবীর বর্ণবৈভব রিক্ত হয়ে আসে, এবং সেই সময় অসূর্যম্পশ্যা

রজনীগন্ধার ভীরু পদসঞ্চার। কবিকল্পনার এই আলিম্পন যেকোন হৃদয়কেই স্পর্শ করে, 'ধূমপায়ী কবি' না হয়েও যে কল্পনাস্বরূপের পরিচয় কবি এখানে রেখে গেলেন তাতে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে কল্পনা ও ধূম স্বজাতি নয়, স্বগোত্র-ও নয়।

তিনি যে তা জানতেন না বা মানতেন না, তাঁর কবিতা অন্তত তার পরিচয় দেয় না। কবিতার এই অন্তর্গত স্বভাবের প্রতি তাঁর আনুগত্যই বরং বার বার প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি একটি কবিতায় সুরদাসের ভূমিকাতেও তিনি অধিষ্ঠান চেয়েছিলেন। সন্দেহ নেই তিনি সম্বোধন করেছিলেন পূরবী-কেই, চেয়েছিলেন পূরবী সুরেরই দাসত্ব, কিন্তু এই সুরের পরিচয় কি ? 'সন্ধ্যার ছায়ায় লীন, মলিন,' চোখে যার বিষাদ, 'মনে সন্ধ্যা আনে' যার গান। এই সুরই তো আমরা শুনে এসেছি তাঁর কবিতায়, যাতে এই মলিন সন্ধ্যার বোধগত বিষন্নতা, এই শান্ত উদাসীনতার চিহ্নখচিত চিন্তা।

অথচ পদ্যের গুণ বলতে তিনি অসহায়ভাবে শুধুই বললেন rhyme-এর কথা। এবং তাঁর কবিতায় গদ্যের বিশেষ গুণ reason-এর চর্চার কথা। তাঁর কবিতায় যুক্তি ধর্মের যোগ অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, আর যুক্তি যে গদ্যের একটি গুণ তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিতারও একটি নিজস্ব যুক্তিক্রম সব সময়েই থাকে, এবং গদ্যগুণ রূপে যুক্তিধর্মের চর্চাও যদি কবিতায় করতে হয়, সেই গুণকে আবশ্যিকভাবেই কবিতার অনুগত হতে হবে, নিতান্ত একটি গদ্যগুণ রূপে কাব্যে তার কোন মূল্য থাকে না। এই গদ্যগুণকে বহিরঙ্গতা অতিক্রম করে তিনি কতখানি কাব্যগুণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, তার সমীক্ষা দুর্ভাগ্যবশত এখন পর্যন্ত হয় নি।

তিনি কবিতা লিখেছিলেন ভিতর প্রেরণায়, নতুবা তাঁর সমস্ত কাব্যায়োজনকে সম্ভবত এ্যাডঃভঞ্চারিজ্‌ম্ বলা যেতো। বিশুদ্ধ কাব্যানুভূতিই তাঁর কবিতার উৎস, এবং কয়েকটি চমৎকার কবিতা লিখে গেছেন সনাতন বা প্রচলিত উচ্চারণ রীতিতেই। 'একদিন,' 'প্রতিমা' ইত্যাদি কবিতার কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে। তাঁর সৎ অনুভূতি সৎ অথচ নবীন উচ্চারণ বিধি খুঁজে পায় নি, খণ্ড চেষ্টাগুলিকে মেলাতে পারে নি প্রয়োজনীয় তাৎপর্যে, এবং অনিবার্যভাবে তাঁকে বলতে হলো :

ভাষা ভাব এলো করা, কবিতাকে খেলো করা
হয় তাহা জানি।
তাই বলে শুধু রঙ্গ, কাব্যে করা অঙ্গভঙ্গ,
ভালো নাহি মানি।

আর, আমাদের কাছে থেকে গেল এক সুন্দর কবিপ্রাণতার অসহায় চেষ্টার ১০৯টি উদাহরণ।

স্মৃতির আকার : জীবনানন্দ দাশের কবিতা

আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সিনেট হলের কবি-সম্মেলনে জীবনানন্দ দাশ স্বরচিত কবিতা পড়ে গেলেন। পড়েছিলেন আরও অনেকেই। এর পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আলাদা করে এসে কবিতা পড়ে গেলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'কৃত্তিবাস' তখনও বোধহয় বেরোয় নি, কিন্তু 'কবিতা' চলছে। আমরা তাকিয়ে থাকতুম 'কবিতা ভবনের' দিকে, আর সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে এলে বাঁ-দিকের সেই ছোট্ট সাজানো-গুছনো দোকানটার দিকে, যেখান থেকে আমরা তখন একটার পর একটা নতুন কবিতার বই উপহার পাচ্ছিলুম,—সিগনেটের দোকান।

সমস্ত কলকাতা জুড়ে কিনা জানি না, কিন্তু কলেজ স্ট্রিট বা দেশপ্রিয় পার্কের আশপাশ অঞ্চলে তখন কবিতার বাতাস বইত। সেই সময় সিগনেট আমাদের একটা বই উপহার দিয়েছিল—দুরন্ত দুপুর—নরেশ গুহ-র সেই ছোট্ট ছিমছাম কবিতার বই, যা তিনি বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। বইটি এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না, ভুলে গেছি কি কি কবিতা ছিল সেই বইয়ে; কিন্তু এখনো, কোন এপ্রিলের দুপুরে রেড রোডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা লাইন কখনো কখনো লাফিয়ে এসে পড়ে, যাকে চিনি বললে সব হয় না, যাকে এখনো উচ্চারণ করি:

দুপুরে দুরন্ত হাওয়া,
মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।

না, এ কোনো স্মৃতিচর্চা নয়, অথচ স্মৃতি যে, সন্দেহ কি। সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল: সমুদ্র যে ধ্বনির ভাষায় উচ্চারিত হয়, একদিন তিনি সেই ভাষা জানতেন, আজ তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু ওই ধ্বনি-সঙ্গীত শুনেই তো তিনি বলে উঠলেন: জানতুম, জানতুম। 'ডাকঘর'-এর অমল যখন বলে:

> আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে—ওই গাছের সারের মধ্য দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল।

তখন কি মনে হচ্ছিল অমলের? যাই মনে হোক, তার কোন আকার নেই, আয়তন নেই, তবু মনে যে হচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বনলতা সেন যখন শুধোন: 'মনে আছে?', তখন বালির ওপরকার জ্যোৎস্নায় বিচূর্ণ থামের মতো খেজুরের ইতস্তত: ছায়াই কেঁপে ওঠে; 'দাঁড়ায়ে রয়েছে, মৃত, ম্লান' বা 'শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের' ইত্যাদি বিবৃতি-ধর্মী উক্তিগুলি সেখানে নিতান্ত নিঃস্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে মাত্র।

কবিরা, এই ভাবেই খুলে দেন স্মৃতির দরজা: ঘরে এসে ঢুকে যায় মস্ত আকাশ, অন্তহীন হাওয়ার রাত,—প্রায় অনিবারণীয় রূপে, ভেঙে যায় সমস্ত যা কিছু আকারগত ও অন্তরালবাচক, এবং তখনই মনে হতে পারে:

মশারীটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে।

এবং স্মৃতি সময়েরই রচনা। বনলতা সেন, মিশরের মানুষী, ভূমধ্যসাগরের কিনারে কোন নগরী, বেবিলন, বিদর্ভ নগর—ইত্যাদি পটভূমি বা চরিত্র যাই হোক না কেন, তা একটা সময়কালেই জীবিত থাকে; কিন্তু সেই সময়ের বোধকে যদি বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়? তারা সময়সীমায় বিকশিত হয়, সম্পর্কে নিরূপিত হয়, রঙে রেখায় উজ্জ্বল বা বিষণ্ণ হয়, কিন্তু সেই সময়কে যদি আরও টেনে নেওয়া যায়? তখনই তো মনে হতে পারে:

দূরে
অনেক দূরে
খর রৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে গান গায় গান গায়
এই দুপুরের বাতাস।

পুরাতন সময় রূপ নিয়ে ধরা দিতে চায়, কিন্তু গান হয়ে উচ্চারিত হয়। গানেরও অবশ্য একটা শ্রুতিগ্রাহ্য চেহারা আছে, কিন্তু গান আমাদের সেই আকার থেকে মুক্তি দেয়, আমাদের চারধারে গড়ে দেয় একটা পরিমণ্ডল, যেখানে গ্রীষ্মের সন্ধ্যার মতো আকাশ অনেক দূরে উঠে যায়, নিঃশ্বাস নেবার মতো অনেক বেশি হওয়া পাওয়া যায় যেখানে;—গড়ে ওঠে একটা বিস্তীর্ণতা, জীবনানন্দ অবশ্য 'ব্যাপ্তি' শব্দটা ভালোবাসতেন।

আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজো যেন
লেগে আছে বহতা পাখায়

বা, আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি

সুসেন ল্যাঙ্গার সম্ভবত একেই বলতে চেয়েছিলেন 'musical space', বাংলায় 'সাঙ্গীতিক আয়তন' শব্দবন্ধটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যাই হোক, 'হায় চিল' কবিতাটির মধ্যে জীবনানন্দ আশ্চর্যভাবে সেই আয়তনটি তৈরী করে গেলেন। 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে', বা 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে' ইত্যাদি বিখ্যাত পংক্তি বা পংক্তি-খণ্ড নয়, 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'—মধ্যবর্তী এই পংক্তিটিই প্রকৃতপক্ষে সেই spatial illusion-টি এখানে তৈরী করে গেল। আধুনিক চিত্রশিল্পীরা তাঁদের রচনায় যেমন space বা আয়তনকে ব্যবহার করেন, জীবনানন্দও অনেকটা তেমনি করে স্মৃতি-তাৎপর্যে সময়কে ব্যবহার করে গেছেন। এবং জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় স্মৃতির ব্যবহারকে একটি প্রকরণগত অভিপ্রায়ে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হতে পারে।

আর, স্মৃতির যদি কোন কাল থাকে, তা অতীতকালীন; বর্তমানকালে তা স্মরণযোগ্য মাত্র। যে কোনো সাহিত্যশিল্পই স্মৃতির উচ্চারণ এবং স্মৃতির ব্যক্তিগত হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। 'একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট ভরা কলকাতা' যখন কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে, বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর' তখন ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সংলগ্ন না হয়েও অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে যায়—অস্তিত্ববোধের প্রসরণের মধ্য দিয়েই তা সাধ্য। আসলে, সচরাচর আমরা যাকে স্মৃতি বলি, অর্থাৎ প্রাক্তনের স্মরণ, তা থেকে এই স্মৃতির অন্তর্গত-প্রকৃতি একটু আলাদা: তথাকথিত বিস্মৃতির অন্ধকার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে কিছু চিহ্ন, চিরন্তনতার প্রেক্ষাপটে চিরন্তনের স্মারকরূপে। জীবনানন্দ যখন 'হাওয়ার রাত'-এর বর্ণনা দিচ্ছেন:

> জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
> শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ

তখন কি শুধু কাব্যালঙ্কারই তিনি সৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ শুধুই তৈরী করলেন কবিতার অতি-পরিচিত শরীরাংশ? না কি রাত্রির জ্বলজ্বলে সেই বিশাল আকাশ ছিঁড়ে নিয়ে এলো প্রাণোজ্জ্বল উষ্ণতার একটি চিহ্ন, যা অনিবার্যরূপে প্রাক্তন? 'শিকার' কবিতায় তিনি যখন বললেন:

> মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
> আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
> হাজার হাজার বছর আগে একরাতে তেমনি -
> তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো।

—তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে তিনি আমাদের উপহার দিলেন একটি বাসনাবিদ্ধ গাঢ় মুহূর্তের মুক্তো; কবিতার অলঙ্কার সৃষ্টি করলেন না, সেই সময়হত মুক্তোর মুক্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই 'মুক্তি' শব্দটা এখানে জরুরী। তিনি কালের হাত থেকে কালের মুক্তি চেয়েছিলেন এবং মনে হতে পারে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন চিরন্তনতায়। চিরন্তনতা সময়হীনতা নয়, তা সময়ের সম্পূর্ণতার একটি বোধ, যার বিখণ্ডিকরণ প্রায় অসম্ভব। তথাপি জীবনানন্দের ক্ষেত্রে অনেক সময় মনে হওয়া সম্ভব যে, প্রুস্তের মতো তিনি সময়কে অনির্দিষ্টতায় লক্ষ্য করেন না সব সময়, বরং অনেকগুলি ক্ষেত্রেই তিনি সময়কে নির্দিষ্টভাবে দেখতে চান:

সেই সব ছিলো এই জগতে একদিন।
অনেক কমলারঙের রোদ ছিলো,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিলো,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক;
অনেক কমলারঙের রোদ ছিলো,
অনেক কমলারঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;

লক্ষ্য করা যাবে, উদ্ধৃত এই সাতটি পংক্তিতে তিনি অতীতকালজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ 'ছিলো' ছ'বার ব্যবহার করেছেন। এই রকম একটা ব্যাখ্যা শুনেছি যে, অতীতকে নিয়ে এইভাবে একটা নস্ট্যালজিক অনুভূতিকেই তিনি এখানে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছেন; কিন্তু এরই মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে একটা রঙ্, ঐশ্বর্যের মধ্যেও যে বেদনার রঙ্ থাকে, সেই রঙ্। কালগত বিচ্ছিন্নতার বোধ দিয়েই কি তিনি এই বেদনার প্রসাধন রচনা করেছিলেন? হতে পারে। নতুবা 'অপরূপ খিলান ও গম্বুজের' রেখা বেদনাময় কেন; নতুবা 'অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি' কেন? এখানে 'খিলান' বা 'গম্বুজ' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি virtual space-ই তৈরী করলেন; আয়নার গভীরে আয়তন কতখানি বিস্তৃত তার যেমন পরিমাপ নেই - সেই রকম একটা spatial illusion সৃষ্টি করলেন; এবং তাকে এসে স্পর্শ করে গেল বেদনার রেখা, অর্থাৎ সময়ের চেতনা। তাজমহলের সামনে দাঁড়ালে অবয়বশায়ী স্থাপত্যের আয়তন-গত ইমেজটি ধরা পড়ে, তেমনি তাকে ঘিরে থাকে একটা সময়ের ইমেজ। Spatial illusion সৃষ্টি করার মধ্য দিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবনানন্দ virtual time-কেও ধরতে চেষ্টা করেছেন।

এবং দেখা যাবে, ওই বর্ণনামূলক অংশের মধ্যেই থেকে গেছে আর একটি

আশ্চর্য পংক্তি বা পংক্তি-খণ্ড,—'আর তুমি ছিলে'—যার মধ্যে অতীত বিষণ্ণতার পল্লবে 'তুমি' আলোড়িত হয়ে উঠছে, অর্থাৎ প্রেম। প্রেমের যে দিকটায় কামনার তাজা রঙ্ ঝলসায়, সেখানেও প্রায় অনিবার্যভাবে বিষাদের ছায়া পড়ে :

> পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
> রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।
> তোমার নগ্ন নির্জন হাত,
> তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে ওই 'নির্জন' শব্দটি থামিয়ে দিল মত্ততা ও নগ্নতার মিলিত রচনা কামনার কল্লোল, আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল, সমস্ত কিছুর সংলগ্ন হয়ে আছে দুর্মর এক নির্জনতা। কবির চেয়ে মুখর যেমন কিছু নেই, কালের চেয়ে সময়ের চেয়ে নির্জনই কি কিছু আছে? জীবনানন্দের ক্ষেত্রে অন্তত সময়ের চেতনাই তাঁর নির্জনতার চেতনা। ওই আয়োজনের মধ্যে তিনি সেই নির্জনতা দেখলেন, প্রায় রেডিওলজিস্টের মতো করে, একটা ঠাণ্ডা হিম এসে স্পর্শ করে গেল সমস্তকে, তবু কবির কাছে ধরা পড়ে যে—'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ'। 'আমোদ' শব্দটির মধ্যে তরলতার একটি সংস্কার প্রচলিত হয়ে গেছে বলে আপত্তি থাকতে পারে, অন্যথায় তাকে বলা যেতে পারে আনন্দ, এবং 'তুমি' কে ঘিরে যে আবেগের অনুষঙ্গ রচিত হয়ে যায়, তার রঙ্ আনন্দের, নির্জনতার ফ্রেমে উজ্জ্বল একটি মুক্তোর মতো, যেমন নিরবধি আকাশে একটি নক্ষত্র। ভয়াবহ গভীর স্তব্ধ আকাশের মধ্যে ওই নক্ষত্র তার আলোর শরীর নিয়েও স্তব্ধ হয়ে থাকে। সময়ের গাঢ় গম্ভীর নির্জনতার মধ্যে উজ্জ্বল স্মৃতি যখন শরীরী হয়ে উঠতে চায় তখনও সে নীরবতার অন্তরাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। সে উন্মীলিত হয়, ফুল যেমন করে উন্মীলিত হয়, কিন্তু ক্রিয়াচঞ্চল গতিশীলতায় আত্মপ্রকাশ করে না। ফলে স্মৃতি এখানে স্তবশায়ী, প্রুস্ত সম্পর্কে ক্লাইভ বেল যেমন বলেছিলেন, 'in state, not action.'

সময়ানুভূতিই জীবনানন্দের কবিতার প্রধান ভূমিস্তর। এই সময়ের মধ্যে তিনি স্মৃতির আকার গড়ে তুলতে চান, বা বলা যায়, স্মৃতিকেই তিনি বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করেন। এই ভাবেই তাঁর কবিতায় কখনো কখনো একটা musical space তৈরী হয়ে যায়, এবং এই প্রকরণের সাহায্যেই তিনি একটা spatial illusion সৃষ্টি করেন,—যা তাঁর কবিতাকে একটা বিশেষ চারিত্র্য দিয়েছে। এই চারিত্র্য শুধু অনুভূতি-তাৎপর্যের দিক থেকে লক্ষ্য করতে গেলে ভুল হবে, কবিতার

সাংগঠনিক তাৎপর্যে স্থাপন করতে পেরেছিলেন বলেই এতে তিনি emotional significance রচনার দিক থেকে লাভবান হয়েছিলেন।

স্মৃতিকে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় যেভাবে ব্যবহার করেন, তার ফলে তাঁর কবিতায় আর একটি সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করে—গল্পের সম্ভাবনা—যাকে তিনি সচেতনভাবেই তাঁর কবিতার উপকরণরূপে নিরূপণ করে নিয়েছিলেন। তিনি গল্প-কবিতা লেখেন নি, অথচ গল্পের স্পর্শ এমন কি লিরিক কবিতাকেও কতখানি বিস্তীর্ণ করে দিতে পারে, তিনি তার পরীক্ষা করে গেলেন। গাল্পিক একটা অনুষঙ্গকে কবিতার সাংগঠনিক উপকরণরূপে ব্যবহারে তিনি প্রায় উৎসবের উৎসাহ দেখিয়ে গেছেন।

গল্পের প্রতি জীবনানন্দের যে মর্মগত আকর্ষণ ছিল, কখনো তিনি তা আড়াল করেন নি :

১। তাদের মাঠের গল্প—তাদের মাঠের গল্প শেষ হলে অনেক তবুও থাকে বাকি—

২। সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা।

৩। ধানের রসের গল্প পৃথিবীর।

৪। ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী।

৫। অনেক পুরোনো শিশিরভেজা গল্প।

৬। তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল।

এই রকম হয়তো আরও উদাহরণ থাকতে পারে; কিন্তু লক্ষ্য করা যাবে যে, এর মধ্যে কোন গল্প নেই। গল্পের মধ্যে ঘটনা ও ক্রিয়াশীলতার বেগ থাকে, এবং শ্রেণী-চিহ্নের দিক থেকে তা অব্‌জেক্‌টিভ্‌ প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে। এখানে কবি শুধুই গল্পের কথা বললেন, অথচ গল্প বললেন না; এবং সমস্ত ব্যাপারটা একটা সাব্‌জেক্‌টিভ্‌ পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। গল্পের মধ্যে বিষয়, কৌতূহল ও কল্পনার যে মুক্তি ঘটে, সেই মুক্ত অবকাশটুকুই প্রকৃতপক্ষে এখানে কবির অভিপ্রেত।

লিরিক মগ্ন অনুভূতির উচ্চারণ; কিন্তু যাকে আমরা বর্ণনামূলক রচনা বা ন্যারেটিভ্‌ বলি, লিরিক কবিতার উপকরণ রূপে তার ব্যবহারে উদাহরণ অনেক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে লিরিকে ন্যারেটিভের ব্যবহার নিতান্তই উপাদানগত, কেননা দুই ধরনের রচনার অভিপ্রায় ও প্রেরণাভূমি সম্পূর্ণভাবে আলাদা। যেখানে বর্ণনামূলকতাই মূল অভিপ্রায়, সেখানে ন্যারেটিভে একটা নূতন প্রত্যাশা যুক্ত হয়ে যায়, গল্পের প্রত্যাশা; কিন্তু লিরিকে ন্যারেটিভের উপাদান একটা পরিবেশ একটা

ছবি বা অনুভূতিময় আত্ম-প্রকাশের একটি আধার-খণ্ড রূপেই সংলগ্নতা পায়। জীবনানন্দের কবিতায় ন্যারেটিভের উপাদানের ব্যবহার বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক মাত্র নয়, একটা গুরুতর প্রাকরণিক তাৎপর্যেই তিনি তা ব্যবহার করেছিলেন।

খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, বুদ্ধদেব বসুই সম্ভবত এদিকে আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি যখন লেখেন 'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল', তখন তিনি জীবনানন্দের কবিতার ন্যারেটিভ্ লক্ষণের প্রতিই সংকেত করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি যে, ন্যারেটিভের প্রধান লক্ষণই বিষয়পরতা, অথচ জীবনানন্দ আত্মগত বলেই গীতিকবিতার লেখক। একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য-পরিমণ্ডল তিনি এইভাবে রচনা করছেন :

> মিনারের মতো মেঘ সোনালী চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
> বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
> নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে ;
> খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে,
> বাতাসে ঝিঁ ঝিঁ-র গন্ধ—

এখানে বিবরণধর্মই মুখ্য, সন্দেহ নেই ; তথাপি লক্ষণীয় যে কবির ব্যক্তি-অনুভূতির স্পর্শেই এখানে চড়ুয়ের ডিম নীল, বা উঠোনের জ্যোৎস্না জ্যোৎস্নার উঠোন হয়ে যায়। অব্জেক্টিভ্ প্যাটার্নের যথাযথতার ভিত্তিকে তা হলে কি এই ভাবেই তিনি শিথিল করে দিতে চেয়েছিলেন? অথবা সাব্জেক্টিভ্ ধর্ম এইভাবেই অব্জেক্টিভ্ প্রকৃতিকে বিপর্যস্ত করে? বাইরের দিক থেকে দেখলে এর যেকোনোওটা আপাতত মনে হতে পারে অবশ্য, কিন্তু বিবরণ-ধর্মে এই রকম ব্যাপার কার্যকালে অনেক সময়েই ঘটে থাকে, তাতে ন্যারেটিভ্ রচনার প্রকৃতি স্খলিত হয় না। 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিবরণমূলক অংশ এই রকম :

> এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

ন্যারেটিভের এই বিবরণ-ধর্মী অংশে বিষয়ের সঙ্গে কল্পনার একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অব্জেক্টিভিটির ভিতটি এতে দুর্বল হয়েছে বলে হয়তো কেউ অনমনীয়ভাবে দাবি করবেন না। Actual-এর Virtual-এ রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই আসলে এই যোগটি থাকে।

জীবনানন্দের ঢঙ্টি, ফলত, ন্যারেটিভেরই। 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি যখন লিখলেন :

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

তখন এই বিবরণাত্মক অংশটিকে বিষয়গত উপস্থাপনাতেই তিনি চরিতার্থ করেন। 'আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন'—এই পংক্তির মতো নিতান্তই সংবাদ-জ্ঞাপক বিষয়নিষ্ঠ পংক্তিটিও প্রসঙ্গত লক্ষ্য করতে বলি। এই অংশের মধ্যে ব্যক্তি-স্পর্শ বিষয়নিষ্ঠাকে যদি কিছু আহত করে থাকে, তা ওই হাজার বছর ধরে পথ হাঁটবার অসম্ভাব্যতার পরিকল্পনা, এবং বহিরঙ্গভাবে উত্তমপুরুষের উচ্চারণ।

তথাপি বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করা তাঁর অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না ; একটি পরিবেশ, একটি দৃশ্যচিত্র বা অনুভূতিময় আত্মপ্রকাশের উদ্দীপনভূমির উপস্থাপনাতেই ন্যারেটিভের ঢঙটিকে তিনি ব্যবহার করে গেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার এই বর্ণনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার frequency-র দিক থেকে একটু বেশি বলে মনে হতে পারে, এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি অন্তত একটি বিশেষ ফললাভ করেছিলেন। তিনি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্মতায় লক্ষ্য করবার একটি প্রকরণগত সুযোগ এইভাবে তৈরী করে নিয়েছিলেন। বর্ণনাধর্ম লিরিকে উপাদান মাত্র বলে বর্ণনাধর্মী রচনায় বিষয়ের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের যে সুযোগ থাকে, এখানে তা থাকে না। অথচ জীবনানন্দের বর্ণনায় এই ডিটেলের ব্যাপারটি তাঁর কবিতার আস্বাদনভূমির একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে।

ন্যারেটিভের অনেকগুলি উপাদানই জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য অন্যান্য সাহিত্যশিল্প থেকে লিরিকের গঠনগত ব্যবধানটি যে সম্পূর্ণ মৌলিক, একথা সম্ভবত ঠিক নয়, লিরিকের মধ্যে যে-সব উপাদান ব্যবহৃত হয়, সাহিত্যের অন্য শ্রেণীতেও তার উপস্থিত লক্ষ্য করা যাবে। লিরিকের উচ্চারণ উত্তমপুরুষের উচ্চারণ ; কিন্তু ব্যালাড, উপন্যাস, এমন কি প্রবন্ধ সাহিত্যেও এই রীতির অনুসরণ কখনো কখনো দেখা যায়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, ঐ সব ক্ষেত্রে এই রীতির ব্যবহার ব্যতিক্রম মাত্র, লিরিকের ক্ষেত্রে তা স্বতঃসিদ্ধ। এইরকমভাবেই আবার দেখা যাবে যে, প্রত্যক্ষ সম্বোধনমূলক উক্তি ঐ-সব রচনার একটি সামান্য লক্ষণের মতো :

মৈমনসিংহ গীতিকায়ঃ 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুব্যা মরি।'

কিম্বা, চন্দ্রশেখরের উক্তিঃ 'প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?'

কিন্তু লিরিকে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেনঃ

'জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না।
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।

বা জীবনানন্দ বলেন,

'শোনো,
তবু এ মৃতের গল্প

তখন, বহিরঙ্গে সম্বোধনধর্মী প্রত্যক্ষতায় এর উচ্চারণ নির্ধারিত হলেও, এ যে প্রত্যক্ষ উক্তিমূলক বাচন নয়, তা আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি, একে লিরিকের একটি সাংগঠনিক লক্ষণ রূপে সহজেই নিরূপণ করে নিই। এখানে কোন চরিত্র কথা বলছে না, এমন কি লেখক পাঠককে উদ্দেশ্য করেও বলছেন না, এটা নিতান্তই একটা পদ্ধতি, যাকে লিরিকের কবিরা কখনো কখনো ব্যবহার করে থাকেন তাদের মন্ময় আত্মপ্রকাশে নৈর্ব্যাক্তিকতার একটা মাত্রা যোগ করা সম্ভব হয় বলে।

তথাপি, দেখা যাবে, ন্যারেটিভ্ কবিতার পক্ষে স্বাভাবিক উপাদান—উক্তির ব্যবহার—তার ন্যারেটিভ্ লক্ষণ নিয়েই জীবনানন্দের কবিতার শরীর-গঠনে ঘনিষ্ঠ-যোগে গৃহীত হয়েছে। ন্যারেটিভের উক্তি স্পষ্টতই চরিত্রের উক্তি, অর্থাৎ এক চরিত্র অন্য চরিত্রের প্রতি উক্তি, ফলে, সেখানে উক্তির চরিত্র ব্যক্তিক। চরিত্রের মুখে উক্তি স্থাপনের এই রীতিটি জীবনানন্দ প্রগাঢ় মনস্কতায় তার উচ্চারণের সংলগ্ন করে নিয়েছিলেন,

আমাকে খোঁজ না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাক,—এক নক্ষত্রের নিচে তবু—একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি, পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি?'—বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে

এখানে 'সে'-সর্বনামের আড়ালে নারীর সঙ্গীর উক্তিকেই আমরা পাচ্ছি। 'হয় নাকি?'—এই জিজ্ঞাসা বা সংশয় উচ্চারণ করেই 'সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে'। অর্থাৎ প্রত্যক্ষরেখায়, বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেই, বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, সঙ্গীর এই উক্তি সঙ্গিনীর উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত। স্পষ্টভাবে উদ্দিষ্টমুখী

হলেই উক্তির যোগ্যতা প্রাতষ্ঠিত হয়; এখানে সঙ্গীর উক্তিকে সেইরকমভাবেই যোগ্য করে তোলার চেষ্টা আছে। ঠিক একইভাবে সঙ্গিনীর উক্তির উত্থাপন করা হয়েছে :

নারী তার সঙ্গীকে : 'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়, জানি আমি ;......'

নারীর এই উক্তিতে স্পষ্টতই সঙ্গী প্রেমিকার উক্তি-খণ্ড—'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়'—অংশের অনুমোদন, অর্থাৎ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর। উক্তি-প্রত্যুক্তির এই প্রত্যক্ষতা নিয়েই ন্যারেটিভে তার সংস্থান। জীবনানন্দ চরিত্রের মুখে উক্তি স্থাপন করে ন্যারেটিভের একটি উপাদানকে প্রায় তার সামগ্রিক ধর্ম নিয়েই এখানে গ্রহণ করেছিলেন বললে ভুল হয় না। কিন্তু নারীর উক্তির পরবর্তী অংশটিও এখানে লক্ষ্য করা জরুরী, নারী তার সঙ্গীকে বলছে :

'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ; তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ; - একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা
তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের –প্রেমে অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'

প্রেমিকের প্রশ্নে পৃথিবীর নিয়মের বর্ণনা ছিল, সঙ্গে কিছু সংশয় : 'হয় নাকি ?'। প্রেমিকার উত্তরে নিঃসংশয়তা :—'পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়', বা 'তারপর ঝরে গেছে',—সমস্তই 'জানি আমি ;' কিন্তু তবু তো কিছু থাকে, কিছু মনে হতে পারে :

'তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি......'

এই একান্ত ইচ্ছাই বোধহয় বিষয়কে কালের হাত থেকে মুক্তি দেয় ; এখানে বিনয় প্রেম, প্রেমের অনুভূতি এইভাবে চিরন্তন বিষয় হয়ে যায় ; তথাকথিত বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হয়, ফলে তার কালগত চিহ্নেরও পরিবর্তন ঘটে। এতক্ষণ পর্যন্ত যেখানে ছিল পুরাঘটিতের সঙ্গে বর্তমান, সেখানে তাই এলো ভবিষ্যৎ :

এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে,
বা, খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইপ্সিতেরে তার।

কবিতাটি এখানেই শেষ। ভালোবাসাকে কাল-নিরপেক্ষ সত্যভূমিতে আশ্রিত ও আশ্বস্ত দেখতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি কালের হাতে তার সমর্পণও দেখে এসেছেন; দেখেছেন:

ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

এবং কবিতার ওই তৃতীয় স্তবকে, যেখানে পংক্তি-সংখ্যা মাত্র আট, তার ছোট্ট পরিসরেই কবি সমস্ত দ্যোতনাটির রচনা শেষ করেছিলেন:

সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে; চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি.
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নিয়ম ব্যাপ্ত; কিন্তু দুজন যে প্রান্তরে দাঁড়িয়েছিল সেই প্রান্তরও ব্যাপ্ত। চারধারে ঝরে যাওয়া আর মরে যাওয়া, তারই মধ্যে দুজনের দাঁড়িয়ে থাকা, এবং সন্ধান। সন্দেহ নেই, এ আশ্রয় ও আশ্বাসেরই সন্ধান, এবং তারা দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রান্তরে, যা আশ্বস্ত করে, আশ্রয় দেয়:

যেখানে আকাশের খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে সেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে……

আর এখানে এসে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, কবি পেয়ে গেছেন সেই বিষয়াশ্রিত পরম্পরতা, যার পর কবিতার অন্তিম স্তবকে প্রেমিকের মনে হওয়া—'এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে' ইত্যাদি সমস্ত আয়োজনই উপরন্তু বলে মনে হতে পারে। আসলে বিষয়াশ্রিত পরম্পরতা অর্জনের মধ্য দিয়েই কবিতায় নির্ব্যক্তিকরণের কাজটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়; কবি তথাপি ন্যারেটিভের উপাদান ব্যবহার করেছেন, উক্তি স্থাপন করেছেন প্রথম পুরুষের মুখে, চরিত্র আমি নয়, শুধুই সে এবং সে। সন্দেহ নেই, ন্যারেটিভের প্রথম পুরুষ চরিত্র ও তার উক্তি একটা অব্‌জেক্টিভ প্যাটার্নেরই অন্তর্গত ব্যাপার, এবং জীবনানন্দ ন্যারেটিভের এই ধরনের 'উপাদান কবিতায় সাংগঠনিক তাৎপর্যে স্থাপন করে রূপগত দিক থেকে সম্ভবত এক ধরনের নির্ব্যক্তিকতা প্রতিশ্রুত করতে চেয়েছিলেন। 'লোকেন বোসের জর্নাল' বা 'জুহু'-র সোমেন পালিতের গল্পও এই প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে। তথাপি 'দুজন' কবিতায় যেমন দেখা গেল ন্যারেটিভের উপাদান উপরন্তু মাত্র, তা আমাদের এই রকম একটা

ভাবনার ক্ষেত্রে এনে পৌঁছে দেয়, যেখানে মনে হতে পারে, অথবা সঙ্গতভাবেই মনে হওয়া উচিত যে, তিনি সচেতনভাবেই চেয়েছিলেন আখ্যানের প্রচ্ছদ, 'ক্যাম্পে' কবিতায় যেমন করেছিলেন সেই রকম correlative রচনার জন্যে শুধু নয়, রূপের একটা নিয়মের মধ্যে, কিন্তু আখ্যানমূলক কবিতা না লিখে, লিরিকের কবি হিসেবেই।

চরিত্রের মুখে উক্তি স্থাপন করে কবিতার অবয়ব রচনার একটি প্রকরণ জীবনানন্দ ঘনিষ্ঠ মনোযোগে চর্চা করে গিয়েছিলেন, এবং এই চরিত্র-ও বিচিত্র। ইতর প্রাণী, এমন কি অপ্রাণীর মুখেও উক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করি :

ইতর প্রাণী :

ঘুরে ঘুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু'-একটা ইঁদুর এবার—'

বৃক্ষ :

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন দিকে যাবে বলো—তোমরা কোথায় যেতে
চাও ?'

চাঁদ :

মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে,—ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে,—চলে গেছে কবে।'

নক্ষত্র :

'তোমারি নিজের ঘরে চলে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে—
'অথবা ঘাসের' পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে'।

এইরকমভাবে তিনি যে তাঁর কবিতাকে নির্মিত হতে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কবির কোনো বিশিষ্ট অভিপ্রায় ছিল বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, ন্যারেটিভের উপাদান ব্যবহার করেও তার মধ্যে একটি নূতন মাত্রা তিনি যোগ করেছিলেন। পুরাণের জগতে বা রূপকথার জগতে আমরা এই রকম ব্যবহার দেখি ;

সেখানে পাখি কথা বলে, গাছ কথা বলে, এমন কি বৃহত্তর নৈসর্গিক উপাদানের ক্ষেত্রেও মানবিক আচরণ চরিতার্থ হতে দেখা যায়। রূপকথা বা পুরাণ কথামূলক সৃষ্টি, এবং কথামূলক রচনার উপকরণ ব্যবহারে তিনি আদি অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগিয়েছেন। আদিকথাতে গল্প থাকে ঠিকই, কিন্তু সেই গল্পকে ঘিরে থাকে কল্পনার একটা বায়ুমণ্ডল, যেখানে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা লুপ্ত হয়ে যায়, এবং গল্প তার গল্পমাত্রতাকে অতিক্রম করে একটা বিস্তীর্ণ আয়তনকে স্পর্শ করে। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় যে আখ্যানধর্মকে সংলগ্ন করতে চেয়েছেন, তাতে আখ্যানমূলক রচনার ঘটনাঘনিষ্ঠতার বেগ নেই, এমন কি উক্তির ব্যবহারেও নেই। ন্যারেটিভে উক্তি গতিশীল ও সকর্মক, লিরিকে তা নিতান্তই একটা প্রকরণ। রূপকথার জগতের শিথিল মন্থরতা গল্পের মধ্যেই আরেকটা জগৎ গড়ে দেয়, যা বিস্ময়ের, কল্পনার ও বিশ্বাসের জগৎ। জীবনানন্দের কবিতা ন্যারেটিভের লক্ষণকে গ্রহণ করতে গিয়ে ন্যারেটিভের ক্রিয়াশীলতার বেগকে পরিহার করে এবং সমান্তরাল মন্থরতায় তার মধ্যে একটা স্তরবদ্ধ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, যা দূরস্মৃতির কালের মতোই বিস্তীর্ণ অথচ সংবৃত; অর্থাৎ তিনি তাকে গ্রহণ করেন 'in state, not action.'

লিরিক কবিতায় ন্যারেটিভের উপাদান রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনর্গল ব্যবহার করেছিলেন, অন্যান্য কবিরাও স্বভাবতই করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় ন্যারেটিভের উপাদানকে গুরুতর সাংগঠনিক তাৎপর্যের ব্যবহার করবার প্রবণতা ধরা পড়ে। হতে পারে, এর মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তিত্বের নির্বাপণ সম্ভব বলে মনে করেছিলেন, অথবা হতে পারে, এর মধ্য দিয়ে একটা spatial illusion সৃষ্টি করার প্রাকরণিক সুবিধে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু এটা যে তাঁর কবিতার একটি প্রধান উচ্চারণ-সূত্র রূপে কার্যকর হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত, একটা কথা বলে বক্তব্য শেষ করি: জীবনানন্দের এই প্রকরণের আশ্চর্য প্রাণময় উত্তরসাধনা পঞ্চাশের দশকের একজন কবির মধ্যে অন্তত বিশিষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। তিনি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এবং স্মরণ করি, আলোকরঞ্জনকে কবিতা-সম্পর্কিত ভাবনায় এই রকম একটা জিজ্ঞাসায় অতঃপর আন্দোলিত হতে দেখা গেছে: কবিতার নূতন মুক্তি আমরা কোথায় খুঁজবো? আমাদের আবশ্যিক মুক্তি কি তবে ব্যালাডের জগতে? অথবা তার প্রকরণে?

আমরা জানি যে, ব্যালাড ন্যারেটিভের শ্রেণীচিহ্নভুক্ত, এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় তা স্মৃতিকালের অন্তর্গত।

এবং এই জিজ্ঞাসার মধ্যে জীবনানন্দের উত্তরসাধনার ধ্যান নিহিত হয়ে আছে কিনা, তা নিশ্চয়ই অধিকতর মনস্ক বিবেচনায় কেউ পরীক্ষা করে দেখবেন।
